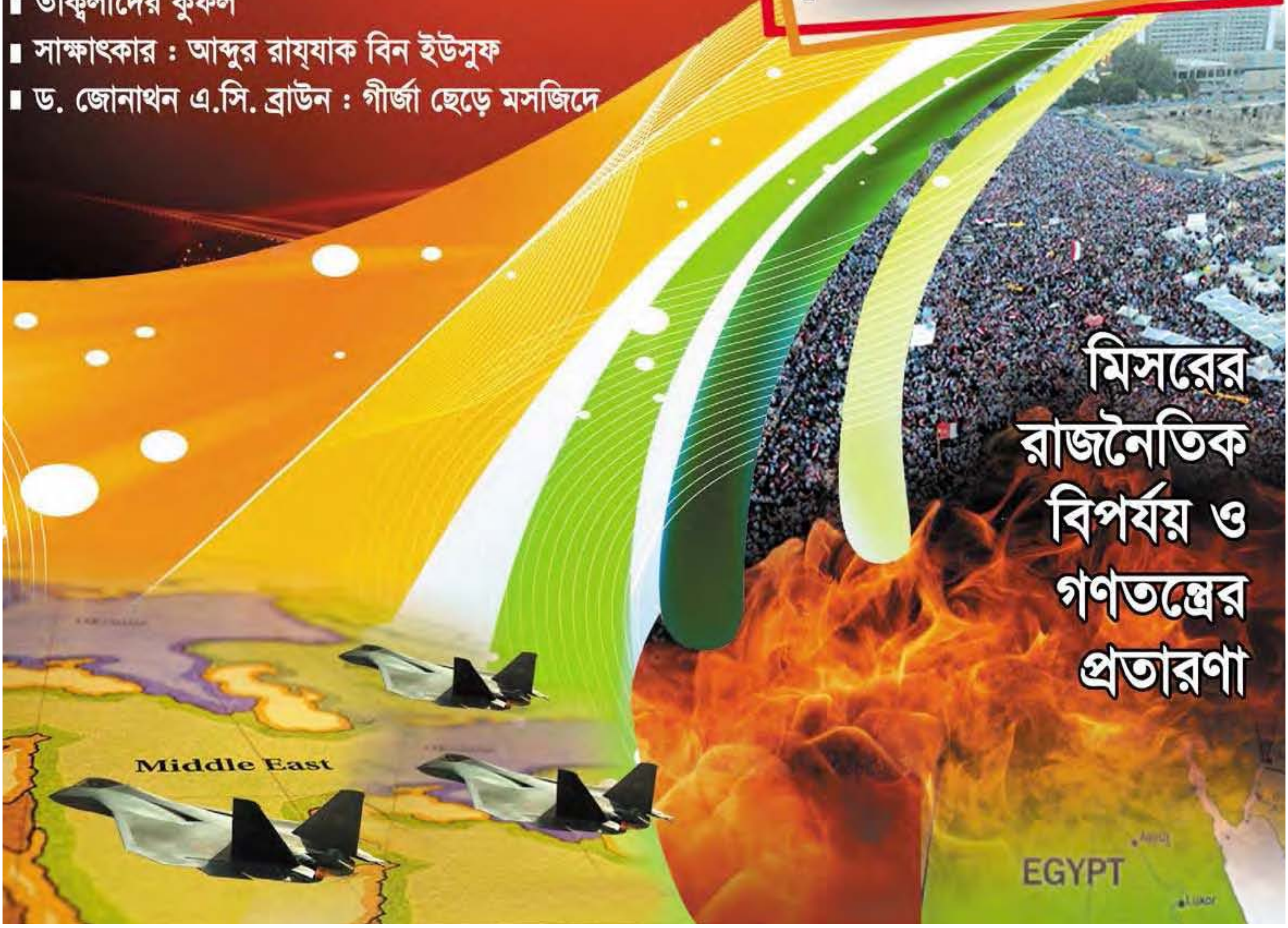
তাওহীদের ডাক

জুলাই-আগস্ট ২০১৩

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا



- ইসলামী খেলাফত : একটি পর্যালোচনা
- স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছিয়াম
- তাক্বলীদের কুফল
- সাক্ষাৎকার : আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ
- ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন : গীর্জা ছেড়ে মসজিদে



মিসরের রাজনৈতিক বিপর্যয় ও গণতন্ত্রের প্রতারণা

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

১৩তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০১৩

যোগাযোগ

তাওহীদের ডাক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪

মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৮২

ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com

ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

Contents

সম্পাদকীয়

ইসলাম বনাম ফের্কাবন্দী :

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক সার্বজনীন জীবন বিধান। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে এর বাস্তব নমুনা বিদ্যমান। তবে এসবের মৌলিক উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমে' চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে ভ্রান্ত পথে চলতে নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ১০১, ১০৩; আন'আম ১৫৩)*। সৎ আমলের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত আমল সম্পর্কে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন *(কাহফ ১০৩-১০৬)*। আল্লাহর উক্ত পথনির্দেশ গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ করবে বলে তিনি নাম রেখেছেন মুসলিম *(হজ্জ ৭৮)*। কিন্তু মুসলিম নামে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! নিশ্চয় এই সোজা পথটি আমার পথ। তোমরা এই পথেরই অনুসরণ করবে। অন্যান্য পথের অনুসরণ কর না। অন্যথা এই সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। এ ব্যপারে আল্লাহ তোমাদেরকে অছিয়ত করছেন, যেন তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর *(আন'আম ১৫৩)*। উক্ত আয়াতে অন্য যাবতীয় পথ বর্জন করে একটি পথে চলতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে মুসলিমদের মাঝে এত বিভক্তি ও দলাদলি কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে এক উম্মতভুক্ত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন সে ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য তা করেননি। সুতরাং তোমরা কল্যাণের দিকে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহ। আর তোমরা কী বিষয়ে মতভেদ করছ সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন' *(মায়েদাহ ৪৮)*।

উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি ব্যতীত সবই জাহান্নামে যাবে। উক্ত জান্নাতী দলের পরিচয় সম্পর্কে বলেন, 'আমি এবং আমার ছাহাবীরা যার উপর আছি তার উপর যারা থাকবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সেটা হল, 'জামা'আত' বা ঐক্যবদ্ধ একটি দল' *(আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) উক্ত হাদীছদ্বয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথিকদের দুইটি পরিচয় তুলে ধরেছেন। আর উক্ত জান্নাতী দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না *(মুসলিম হা/৫০৫৯)*।

অতএব আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত সরল সোজা জান্নাতী পথে চলতে হবে এবং হক্বপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। কারণ হক্বপন্থী জামা'আতের সাথে অবস্থানকে শরী'আত অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে *(বুখারী হা/৭০৮৪; আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচিতির আলোকে উক্ত পথ ও আক্বীদার কয়েকটি নাম মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। (১) সালাফী। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবী তথা পূর্বসুরীদের অনুসারী হিসাবে সালাফী (২) আহলুল হাদীছ বা (৩) আছহাবুল হাদীছ। ছাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীছের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে আহলেহাদীছ বা আছহাবুল হাদীছ। আর কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শরী'আতে হাদীছ বলা হয়েছে *(যুমার ২৩; মুসলিম হা/২০৪২)* (৪) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। এখানে দুই হাদীছে বর্ণিত দুইটি গুণ এক সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম হা/২৭; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭)* (৫) আহলুল ইলম *(বুখারী ২/১০৭৮ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে সকল যুগের বরেণ্য মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম উক্ত নামগুলোই উল্লেখ করেছেন। ভিন্ন কোন নাম বলেননি *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা)*। মূলতঃ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন স্বনামধন্য নামে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নিজেই দু'টি পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তাই শুধু মুসলিম পরিচয় দেয়া রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তেমনি যুগে যুগে পরিচিত ছাহাবায়ে কেরাম বা পূর্বসুরী সালাফীদের রীতিও নয়। আর এটা বলে পরিচয় দেয়ার কোন প্রয়োজনীতাও নেই। কারণ সকলে মুসলিম হয়েই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় *(রূম ২০; বুখারী হা/১৩৮৫)*। এ জন্য আল্লাহ বৈশিষ্ট্যগত নামকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন মুহাজির ও আনছার। এর অর্থ তাঁদেরকে মুসলিম থেকে বের করে দেয়া নয়। বহু স্থানে মুমিন, মুত্তাক্বী, মুহসিন বলে পরিচয় তুলে ধরেছেন। তার অর্থ মুসলিম থেকে বের করা নয়। মূলতঃ 'মুসলিম তত্ত্ব' এটি নতুন থিউরী। বেশী উৎসাহিত কিছু রোগ গ্রস্ত মহল এটাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। যুগ যুগ ধরে পরিচিত বিশ্বনন্দিত নামগুলো নিয়েই খেলা করা হচ্ছে। টিভিতে এ্যাড আকারে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সমাজে প্রচলিত অসংখ্য বিদ'আতী নাম নিয়ে ঐ মহলের ততটা মাথা ব্যথ্যা নেই। যদিও নামকে গুরুত্ব না দিয়ে বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে নামের সাথে কাজের মিল থাকে না, যা বর্তমানে স্পষ্ট। সুতরাং 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমের' পরিচয়টা হল আসল পরিচয়।

Contents

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন বিদ'আতী ও ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। বর্তমানে সেই পথভ্রষ্ট দলের সংখ্যা হাযার হাযার গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম চারটি দল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। (ক) খারেজীরা জাহান্নামের কুকুর *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*। (খ) মুরজিয়া (গ) ক্বাদারিয়া। এই দুইটি দল কাওছারের পানি পান করতে পারবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না *(তাবারাণী আওসাত্ব হা/৪২০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৮)*। (ঘ) শী'আ *(বুখারী হা/৩১০৪; ছহীহাহ হা/২৪৯৪)*। এই দলগুলো মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। এছাড়া উক্ত বাতিল ফের্কাগুলোর শাখ-প্রশাখা হিসাবে রাফেযী, জাবরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা ইত্যাদি দলও রয়েছে। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী নামে প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব চালু আছে। শুধু হানাফী মাযহাবের অনেক দলের জন্ম হয়েছে। শরী'আত, তরীকৃত, হাক্বীকৃত, মা'রেফত নামে ছূফী দর্শন। দেওবন্দী, ব্রেলভী, নকশাবন্দিয়া, ক্বাদারিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি। লক্ষ্য লক্ষ পীর-ফকীরও হানাফী মাযহাবের পরিচয় দেয়। যদিও পরস্পরে যেমন মিল নেই তেমনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাথেও কোন সম্পর্কে নেই। অতএব মুসলিম নামধারী দল হলেই যে সেখানে ভর্তি হতে হবে তা নয়। এজন্য ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন, 'ইসলামী দলসমূহের মধ্যে অনেক ফের্কারই ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ সেগুলো ইসলামী দল নয়। যেমন চরমপন্থী খারেজী জোট'। অন্যত্র তিনি অনেক বাতিল ফের্কার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'ঐ দলগুলো সবই ইসলাম বহির্ভূত। আমরা তাদের প্রতারণা হতে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ ভিক্ষা করছি' *(কিতাবুল ফাছল ১/৩৭১-৭২)*। আব্দুল করীম শহরাস্তানী বলেন, 'শী'আদের দাবীর পক্ষে কুরআনে যেমন দলীল নেই তেমনি মুসলিমদের মাঝেও নেই। কারণ তারা মুসলিম নয়'। রাফেযীদের সম্পর্কেও একই রকম মন্তব্য করেন *(আল-মিলাল ২/৭৮ পৃঃ)*।

পূর্বের মত এখনো অসংখ্য দল গজিয়ে উঠছে। আধুনিক ব্যাখ্যার নামে নতুন নতুন উদ্ভট তথ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তবে বিশ্লেষণের বিষয় হল, হাযারো ভ্রান্ত ফের্কা ও আক্বীদা সৃষ্টি হলেও আল্লাহ্র গযবে তা ধ্বংস হয়েছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে, অসংখ্য মাযহাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু সালাফী বা আহলুল হাদীছ আক্বীদা ও পথকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন। অতএব ভ্রান্ত দর্শন যতই সৃষ্টি হোক তার ধ্বংস অনিবার্য। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো সালাফীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আক্বীদা ও আমল এবং ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা ও বুঝকে তারা পরওয়া করেনি। তারা ইসলাকে টুকরো টুকরো করেছে *(আন'আম ১৫৯)*। এরাই ক্বিয়ামতের মাঠে কাওছারের পানি থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রতি অভিশাপ করবেন এবং বিতাড়িত করবেন *(বুখারী হা/৬৫৮৩)*। সুতরাং হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া কোন রাস্তায় পা দেয়া যাবে না। কারণ এগুলো সব জাহান্নামের রাস্তা। ইসলামে নতুন রাস্তা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমাদেরকে ইসলামের নামে সৃষ্ট যাবতীয় দল-উপদল প্রত্যাখ্যান করতে হবে। প্রতি ছালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সেই সরল পথের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে হবে। প্রকৃতার্থে যারা সালাফী, আহলেহাদীছ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় বিশ্বাসী তাদের সাথে অবস্থান করতে হবে। 'উলুল আমর' হিসাবে শরী'আত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আলেমের দলীল ভিত্তিক নির্দেশনায় পথ চলতে হবে *(নিসা ৫৯; নাহল ৪৩-৪৪)*, যার নির্দেশনা ছাহাবীদের সাথে মিল থাকবে।

নির্ভেজাল তাওহীদের অপ্রতিরোধ্য আপোসহীন কাফেলা হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমের' উপর অটল থেকে সোনালী যুগের আদর্শ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মানবতাকে সেই প্লাটফরমের দিকে আহ্বান করছে। তাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা বিরোধী আধুনিক কোন ভুঁইফোড় চরমপন্থী বা নরমপন্থী মতবাদকে বরদাশ্ত করে না। সেটা কথিত ইসলামের নামে হোক বা নব্য জাহেলিয়াতের নামে হোক। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে শিকড়হীন উদ্ভট ফের্কাগুলো এই দ্বীনী সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে। অনেক মিডিয়া না জেনেই মিথ্যাচার করছে। অনেক সময় প্রশাসনের লোকেরা ঐ মিথ্যাচারে প্ররোচিত হয়ে বিভিন্ন কাজে বাধা সৃষ্টি করছে এবং কর্মীদের হয়রানি করছে। আমরা বিশ্বাস করি সত্য চিরদিন বিজয়ী আর মিথ্যা চিরদিন পরাজিত। নমরূদ, ফেরাঊন, আবু জাহাল চির লাঞ্ছিত, ইবরাহীম, মূসা, মুহাম্মাদ (ছাঃ) চির সম্মানিত। অতএব বাতিল ফের্কা নিপাত যাক, চির সত্য প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহ আমাদেরকে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে' পরিচালিত করুন- আমীন!!

আল্লাহ্‌র প্রতি শোকরগুযারী

আল-কুরআনুল কারীম :

১ - فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ

'অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ও অবিশ্বাসী হয়ো না' *(বাক্বারাহ ১৫২)*।

২ - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা করে থাক' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

৩ - قَالَ يا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

'তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হ'তে মনোনীত করেছি, অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছি তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(আ'রাফ ১৪৪)*।

৪ - إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'তোমরাতো আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর তোমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আনকাবূত ১৭)*।

৫ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ

'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই এগুলোর মালিক। এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার্য হিসাবে গ্রহণ করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর রয়েছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না? *(ইয়াসীন ৭১-৭৩)*।

৬ - وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি (এ মর্মে) অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(যুমার ৬৫-৬৬)*।

৭ - وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো' *(আলে-ইমরান ১২৩)*।

৮ - وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মৎস্য আহার করতে পার এবং আহরণ করতে পার রত্নাবলী, যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এই জন্য যে, তোমরা যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার' *(নাহল ১৪)*।

৯ - وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'তিনি তার দয়ায় তোমাদের জন্য আবির্ভাব ঘটিয়েছেন রজনী ও দিবসের, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার' *(ক্বাছাছ ৭৩)*।

১০ - اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তার আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও' *(জাছিয়া ১২)*।

১১ - إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

'তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন' *(যুমার ৭)*।

১২ - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

'এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছেন, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাৎপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পশ্চাৎপদে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহ্‌র কোনই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন' *(আলে ইমরান ১৪৪)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১৩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلُ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী খাদ্যগ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতিদান ধৈর্যধারণকারী ছায়েমের ন্যায়' *(মুসনাদে আহমাদ হা/৭৮৭৬; ছহীহুল জামে' হা/২১৭৯)*।

১৪ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. وَقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি পথ চলাকালে একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল রাস্তায় পেয়ে তা সরিয়ে দিল এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি আরোও বললেন, শহীদ পাঁচ প্রকার। যথা ১. প্লেগরোগাক্রান্ত ২. উদরাময়গ্রস্থ ৩. ডুবন্ত ৪.

কোন কিছু চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহ্র পথে জীবনদানকারী শহীদ' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫০৪৯; মুয়াত্ত্বা হা/৪৩১)*।

১৫– عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ–

ছুহায়ব (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া এ বৈশিষ্ট্য কেউ লাভ করতে পারে না। তারা সুখের অবস্থায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখ-মুছীবতে আক্রান্ত হ'লে ধৈর্যধারণ করে, তখন এটাই তার জন্য কল্যাণকর হয় *(ছহীহ মুসলিম হা/৭৬৯২; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

১৬– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ–

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কাউকে কিছু দান করা হলে সে যেন সামর্থ্য থাকলে তার প্রতিদান দেয়। যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে সে যেন তার প্রশংসা করে। সে তার প্রশংসা করল তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি তা গোপন রাখল সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল *(আবুদাঊদ হা/৪৮১৩, সনদ হাসান)*।

১৭– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে অপরাধ করলে জাহান্নামে তার ঠিকানাটা কোথায় হত তা দেখানো হবে, যেন সে অধিক অধিক শোকর আদায় করে। আর যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে নেক কাজ করলে জান্নাতে তার স্থান কোথায় হত তা দেখানো হবে, যেন এতে তার আফসোস হয়' *(ছহীহ বুখারী হা/৬৫৬৯; মিশকাত হা/৫৫৯০)*।

১৮– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্রও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না' *(আবুদাঊদ হা/৪৮১১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪১৬, হাদীছ ছহীহ)*।

১৯– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে আবু হুরায়রা! আল্লাহভীরুতা অর্জন কর, তাহলে মানুষদের মধ্য থেকে সর্বাধিক ইবাদতগুযার হবে। অল্পে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হবে। তুমি তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্য মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ কর, তাহ'লে তুমি মু'মিন হবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম প্রতিবেশী হও, তাহ'লে তুমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে। আর কম হাসো, কেননা অধিক হাসিতে অন্তর মরে যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৬)*।

২০– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا–

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার উপর সন্তুষ্ট, যে খাদ্য গ্রহণের পর তার জন্য 'আল-হামদুলিল্লাহ' পড়ে এবং পানীয় পান করার পরে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে' *(ছহীহ মুসলিম হা/৭১০৮; মিশকাত হা/৪২০০)*।

২১– عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ–

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, 'জাযাকাল্লাহ খায়রান' (তোমাকে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকর প্রতিদান দিন) তবে সে যথার্থ প্রশংসা করল' *(তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪)*।

২২– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلاَ يُزَكِّى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا–

আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল। তখন এক লোক তার খুব প্রশংসা করলো। নবী (ছাঃ) বললেন, আফসোস তোমার জন্য! তুমি তো তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। (তারপর তিনি বললেন) যদি কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, আমি তার ব্যাপারে এমন এমন ধারণা পোষণ করি, যদি তার এরূপ হবার কথা অনুমান করা হয়। তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহ্র তুলনায় কেউ কারো পবিত্রতা বর্ণনা করবে না' *(ছহীহ বুখারী হা/৬০৬১; মিশকাত হা/৪৮২৭)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. মুত্বাররিফ (রহঃ) বলেন, لأن أعافى فأشكر، أحبّ إليّ من أن أبتلى فأصبر 'অসুস্থ অবস্থা থেকে সেরে উঠে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়তর, বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার চেয়ে'।

২. আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, নে'আমত শুকরিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর শুকরিয়া প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত। প্রবৃদ্ধির দ্বার কখনো বন্ধ হয় না, যতক্ষণ না বান্দার পক্ষে শুকরিয়া প্রকাশ বন্ধ না হয়।

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন মানুষ বিশুদ্ধ পানি পান করে, অতঃপর তা কোন রকম সমস্যা ছাড়াই পেটে প্রবেশ করে এবং যখন কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায় তখন তার উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, 'কৃতজ্ঞতা হল আল্লাহকে ভয় করা ও সৎকর্ম করা। আর কৃতজ্ঞ সেই যে এই কাজে জড়িত থাকে'।

৫. আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (রহঃ) বলেন, 'ছালাত, ছিয়াম এবং আল্লাহ্র জন্য যে সমস্ত ভাল কাজ সম্পাদন করা হয় সবই শুকরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হল 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা'।

সারবস্তু :

১. শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হল ইমানের পূর্ণতা ও ইসলামের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ কেননা এটা হল তার অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক হল ছবর।
২. শুকরিয়া হল অনুগ্রহ ও অনুগ্রহকারীর প্রতি স্বীকৃতি।
৩. আল্লাহর নিআমত অক্ষুণ্ন থাকা বা বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যম হল শুকরিয়া।
৪. আল্লাহ সন্তুষ্টি ও ভালবাসা প্রাপ্তির মাধ্যম।
৫. কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মানুষের কাছে অধিকতর প্রিয়তর। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষু শীতলকারী। সে অন্যের কল্যাণপ্রাপ্তিতে মুগ্ধ হয় এবং কারো নেআমতে হিংসাবোধ করে না।

তাওহীদুল ইবাদাত

-ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স
অনুবাদ : আবু হেনা

তাওহীদুল ইবাদাত (আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব)

প্রথম দুই শ্রেণীর তাওহীদের ব্যাপক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শুধুমাত্র সেগুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাসই তাওহীদের ইসলামী প্রয়োজনীয়তা পরিপূরণে যথেষ্ট নয়। ইসলামী মতে তাওহীদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তাওহীদে রুবুবিয়াহ এবং আছমা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তাওহীদে ইবাদাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। এই বিষয়টি যে ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত তা হল আল্লাহ নিজেই পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে রাসূলের সময়কার মুশরিকগণ (পৌত্তলিকগণ) তাওহীদের প্রথম দুই শ্রেণীর বহু বিষয় সত্য বলে স্বীকার করেছিল। কুরআনে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে পৌত্তলিকদের বলতে বলেছেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ 'বল কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ' *(ইউনুস ৩১)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ' *(যুখরুফ ৮৭)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হবার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ' *(আনকাবুত ৬৩)*।

মক্কার পৌত্তলিকরা সবাই জানতো যে আল্লাহ হল তাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তাদের প্রভু এবং মালিক তবুও আল্লাহর কাছে ঐ জ্ঞান তাদের মুসলিম বানাতে পারেনি। আল্লাহ বলেছেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে' *(ইউসুফ ১০৬)*।

এই আয়াতের ব্যাপারে তাবেঈ ইমাম মুজাহিদের ভাষ্য হল, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রতিপালন করেন এবং আমাদের জীবন নেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা তাদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেব-দেবতার উপাসনা হতে বিরত করেনি *(তাফসীরে তাবারী)*। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেররা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাজত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভীষণ প্রয়োজন এবং দুর্যোগের সময় তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে হজ্জ, দান, পশু জবেহ, মানত এমনকি উপাসনাও করত। এমনকি তারা ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করছে বলেও দাবি করত। ঐ ধরনের দাবীর কারণে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ 'ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না' *(আলে ইমরান ৬৭)*।

কিছু পৌত্তলিক মক্কাবাসী এমনকি পুনরুত্থান, শেষ বিচার এবং পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য (ক্বদর) বিশ্বাস করত। প্রাক-ইসলামী কবিতায় তাদের এই বিশ্বাসের প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন কবি যুহাইর বলেছিলেন, 'হয় এটা স্থগিত করা হয়েছিল, একটি পুস্তকে রক্ষিত হয়েছিল এবং শেষ বিচার দিনের জন্য রক্ষা করা হয়েছিল নতুবা ত্বরান্বিত করা হয়েছিল এবং প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিল।'

কবি আনতারা বলেছেন বলেছেন, "ওহে এবিল! মৃত্যু হতে তুমি কোথায় পালাবে, যদি আসমানস্থিত আমার স্রষ্টা তোমার ভাগ্যে তা লিখে থাকেন?'।

মক্কাবাসীর তাওহীদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফের) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

ফলে তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাওহীদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই মঙ্গল মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে। অধিকন্তু, মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে যে কোন ধরনের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বান্দার ইবাদতকে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যই করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এটাই সকল নবী-রাসূল কর্তৃক প্রচারিত বার্তার সারমর্ম। আল্লাহ বলেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে (মিথ্যা দেবদেবীকে) বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহল ৩৬)*।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা মানুষের সহজাত ক্ষমতার উর্ধ্বে। মানুষ একটি সসীম সৃষ্টিকর্ম এবং তার নিকট হতে অসীম স্রষ্টার ক্রিয়াকান্ড সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে উপলব্ধি আশা করা যায় না। এই কারণে স্রষ্টা তাঁকে ইবাদত করা মানুষের স্বভাবের একটি অংশ হিসাবে তৈরি করেছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য তিনি নবী-রাসূলদের এবং মানবীয় বোধগম্য কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছিলেন। স্রষ্টার ইবাদত করা উদ্দেশ্য এবং নবী-রাসূলদের প্রধান দাওয়াত ছিল একমাত্র সৃষ্টাকে ইবাদত করা, তথা তাওহীদুল ইবাদাতের ঘোষণা করা। এ কারণে আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহসহ অন্যকে ইবাদত করা কঠিন গুনাহ ও শিরক। যে সূরা আল ফাতিহা মুসলিম নরনারীদের ছালাতে প্রতিদিন অন্তত পক্ষে সতেরবার পড়তে হয় সেই সূরার ৪র্থ আয়াত উল্লেখ করে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই আমবা সাহায্য চাই'। এই বিবৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে করতে হবে যিনি সাড়া দিতে পারেন। রাসূল

(ছাঃ) তাওহীদের দর্শন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলেছেন, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ অর্থাৎ 'তুমি যদি কিছু চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২)*। এরূপ আরো বলা হয়েছে কুরআনের বহু আয়াতে। উদাহরন স্বরূপ–

যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ অর্থাৎ 'আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে' *(বাকারা ১৮৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ অর্থাৎ 'আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতম' *(ক্বাফ ১৬)*।

'তাওহীদে ইবাদাতে'র স্বীকৃতি বিপরীতভাবে সকল প্রকার মধ্যস্থতাকারী অথবা আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদারের সম্পৃক্ততার অস্বীকৃতি অপরিহার্য করে তোলে। যদি কেউ জীবিত ব্যক্তিদের জীবনের উপর অথবা যারা মারা গিয়েছে তাদের আত্মার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য মৃত্যের কাছে প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহর সঙ্গে একজন অংশীদার যুক্ত করে। এই ধরনের প্রার্থনা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মত। রাসূল (সঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন– إِنَّ اَلدُّعَاءَ هُوَ اَلْعِبَادَةُ 'প্রার্থনাই ইবাদত' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাহ হা/২২৩০)*।

আল্লাহ আরো বলেছেন– قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ 'আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর না যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না' *(আম্বিয়া ৬৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা' *(আরাফ ১৯৪)*।

যদি কেউ রাসূল (ছাঃ) অথবা তথাকথিত আউলিয়া, জিন অথবা ফেরেশতাগণের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে এদেরকে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। মূর্খ লোকেরা যখন আব্দুল কাদের জিলানীকে[১] 'গাওছুল আযম' উপাধিতে ভূষিত করে তখন তাওহীদুল ইবাদতের মধ্যে শিরক করে। উপাধিটির আক্ষরিক অর্থ হল 'মুক্তি প্রাপ্তির প্রধান উৎস'। অর্থাৎ 'এমন একজন যিনি বিপদ হতে রক্ষা করার চেয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত'। অথচ এটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ আব্দুল কাদিরকে এই উপাধিতে ডেকে তাঁর সাহায্য এবং আত্মরক্ষা কামনা করে। যদিও আল্লাহ আগেই বলেছেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নাই' *(আন্‌আম ১৭)*।

কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে, যখন মক্কাবাসীদের তাদের মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তারা উত্তর দিল, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى 'আমরা তাদের ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছায়' *(যুমার ৩)*।

মূর্তিগুলিকে শুধুমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ব্যবহার করলেও আল্লাহ তাদের আচার-অনুষ্ঠানের কারণে তাদের পৌত্তলিক বলেছেন।



মুসলিমদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইবাদত করার প্রতি জোর দেয় তারা ভাল ভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে পারেন।

তার্‌সাস নগরীর সলের (পরবর্তীকালে যাকে পল বলা হত) শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে খৃস্টানগণ নবী যিশুখৃস্টের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল এবং তারা যিশুখৃষ্ট ও তাঁর মাতাকে উপাসনা করত। খৃস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকদের (Catholics) প্রতিটি উপলক্ষ্যের জন্য কিছু সাধু (Saint) আছে। ক্যাথলিকরা সাধুদের কাছে সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রার্থনা করে যে, এই সব সাধুরা জাগতিক ঘটনাবলিতে সরাসরিভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। ক্যাথলিকরা তাদের পুরোহিতদের আল্লাহ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবেও ব্যবহার করে। তারা বিশ্বাস করে যে, এইসব পুরোহিতদের কৌমার্য ও ধর্মানুরাগের কারণে আল্লাহ কর্তৃক তাদের কথা শোনার সম্ভবনা বেশী। মধ্যস্থতাকারী সম্বন্ধে বিকৃত বিশ্বাসের কারণে শী'আ সম্প্রাদায়ের বেশীর ভাগ লোক সপ্তাহের কয়েকটি দিন এবং দিনের কয়েক ঘন্টা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসেন–এর প্রতি প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত রেখেছে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইবাদতে শুধু ছিয়াম পালন করা, যাকাত প্রদান, হজ্জ এবং পশু কুরবানী করা ছাড়াও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ভালবাসা, বিশ্বাস এবং ভয়ের মত আবেগও অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে এবং যা শুধুমাত্র স্রষ্টার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে

---

১. আবদুল কাদির (১০৭৭-১১৬৬) বাগদাদের হানাফী ফিকহের অনুগামী একটি দরসগাহের ফকীহ ছিলেন। যদিও তিনি কোরআনের কিছু আয়াতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তবুও তাঁর ধর্মোপদেশ কঠোরভাবে সনাতনী ছিল *(আল-ফাতহ আর-রব্বানী, কায়রো, ১৩০২ পুস্তকে সংগৃহীত)*। ইব্‌নে আরাবী (জন্ম ১১৬৫) তাঁকে যামানার কুতুব হিসাবে ঘোষণা দেন এবং তাঁকে আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর উর্ধ্বে স্থান দেন। আলী ইব্‌নে ইউসুফ আশ-শাওনাফী (মৃত ১৩১৪ খৃ) বাহযাত আল আশরার (কায়রো, ১৩০৪) নামে লিখিত একটি পুস্তকে আব্দুল কাদির-এর উপর বহু কারামত আরোপিত করেন। তাঁর নামানুসারে কাদেরীয়া ছূফী প্রথার নামকরণ করা হয় এবং এর আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও বিধিবিধানের আদি উৎস তার উপর আরোপ করা হয় *(Shorter Encyclopedia of Islam, pp 5-7 and 202-205)*.

হবে। আল্লাহ এই সব আবেগের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে উল্লেখ করেছেন– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ 'তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম' *(বাক্বারা ১৬৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন, أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলকে বহিষ্কার করার জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? মুমিন হলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন' *(তাওবা ১৩)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'আর তোমরা মুমিন হলে আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর' *(মায়েদা ২৩)*।

ইবাদত শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহকে চূড়ান্ত আইন প্রণেতা হিসাবে গণ্য করা। কাজেই এলাহী আইনের বা শরঈ আইনের উপর ভিত্তি না করে ধর্মনিরপেক্ষ আইন বিধান বাস্তবায়ন এলাহী আইনের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে। এই ধরনের বিশ্বাস আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা করার নামান্তর তথা শিরক। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফিরুন)' *(মায়েদা ৪৪)*।

ছাহাবী আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) যিনি খৃস্টান ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে কুরআনের এই আয়াতটি পড়তে শুনলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে ও সন্নাসীদেরকে তাদের প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে' *(তাওবা ৩১)*। তখন তিনি রাসূল (ছাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপাসনা করি না'। রাসূল (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন 'আল্লাহ যা কিছু হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম ঘোষণা করে নি এবং তোমরা সকলে তা হারাম করোনি এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করেনি এবং তোমরা সকলে তা হালাল করোনি?' তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা নিশ্চয়ই আমরা তা করেছি। রাসূল (ছাঃ) তখন উত্তর দিলেন, 'ঐ ভাবেই তোমরা তাদের উপাসনা করেছিলে' *(তিরমিযী হা/৩০৯৫)*।

অতএব তাওহীদুল ইবাদত-এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল শরী'আত বাস্তবায়ন, বিশেষ করে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলিম। বহু তথাকথিত মুসলমান দেশ, যেখানে সরকার আমদানিকৃত ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এবং যেখানে এলাহী আইন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত অথবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে ইসলামী আইন চালু করতে হবে। অনুরূপভাবে মুসলিম দেশ সমূহ যেখানে ইসলামী আইনকানুন চালু রয়েছে সেখানেও শরঈ আইনকানুন প্রবর্তন করতে হবে। কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই আইনকানুন সম্পর্কযুক্ত। মুসলিম দেশে শরী'আহ আইনের পরিবর্তে অনৈসলামিক আইনকানুনের স্বীকৃতি প্রদান করা শিরক এবং এটা একটি কুফরী কাজ। যাদের ক্ষমতা আছে তাদের অবশ্যই এই অনৈসলামিক আইন-কানুন পরিবর্তন করা উচিত। যাদের সে ক্ষমতা নেই তাদের অবশ্যই কুফর-এর বিরুদ্ধে এবং শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের পক্ষে সোচ্চার হওয়া উচিত। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাওহীদ সমুন্নত রাখার জন্য অনৈসলামিক সরকারকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে হবে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক

এই শ্রেণীর শির্ক-এ ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা হয় এবং ইবাদতের পুরস্কার স্রষ্টার নিকট না চেয়ে সৃষ্টির কাছে চাওয়া হয়। পূর্বে বর্ণিত শ্রেণীগুলির মত ইবাদাতে শিরকের প্রধান দুটি রূপ রয়েছে।

(ক) শিরকে আকবর (বড় শিরক)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হলে এই ধরনের শিরক সংঘটিত হয়। এটা আসলে মূর্তিপূজা (বা ব্যক্তি পূজা) যার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ বিশেষ করে সকল নবীকে পাঠিয়েছিলেন। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বক্তব্য থেকে এই মতবাদ সমর্থিত হয়েছে, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহল ৩৬)*।

তাগুতের প্রকৃত অর্থ হল আল্লাহর পাশাপাশি অথবা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুর ইবাদত করা। যথা ভালোবাসা এক ধরনের ইবাদত যার উৎকর্ষতা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে পরিচালিত করা উচিত। ইসলামে আল্লাহকে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হবে তখনই যখন আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত হওয়া যাবে। এটা এই ধরনের ভালবাসা নয় যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির প্রতি অনুভব করে। স্রষ্টার প্রতি ঐ ধরনের ভালবাসা পরিচালনা করা মানে তাঁকে তার সৃষ্টিকর্মের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যা 'আসমা ওয়াছ ছিফাত'-এর শিরক। যে ভালবাসা ইবাদত তা হল, স্রষ্টার প্রতি একজনের ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ফলে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে বিশ্বাসীদের বলতে বলেছেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 'বল তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩১)*।

রাসূল (ছাঃ) তার ছাহাবীদেরকে আরও বলেছিলেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'তোমরা কেউই সত্যিকারের ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পিতা ও সমগ্র মানবজাতির থেকে আমাকে বেশী ভাল না বাসবে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৭)*। রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার ভিত্তি তার মানবিক গুণাবলী নয় বরং তাঁর দাওয়াতের আসমানী উৎপত্তি। এইভাবে আল্লাহকে ভালবাসাও প্রকাশিত হয় তার হুকুমের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 'কেউ রাসূলের অনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*।

আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ 'বল আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অনুগত হও' *(আল ইমরান ৩২)*।

যদি কেউ কোন কিছুর অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি ভালবাসা তার এবং আল্লাহর মধ্যে আসতে দেয় তাহলে সে ঐ বস্তু অথবা ব্যক্তিরই উপাসনা করল। এইভাবে ধনদৌলত অথবা এমনকি একজনের কামনা বাসনাও তার দেবতা হয়ে যেতে পারে। রাসূল (সঃ) বলেছেন, قُلْ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ দিরহামের পূজারীরা সব সময়ই দুর্দশাগ্রস্থ থাকবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১)*। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا 'তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে?' *(ফুরকান ৪৩)*।

ইবাদতে শিরকের পাপ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ইসলামী শরী'আতে। কারণ এটা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে যেমন আল্লাহর বর্ণনায় প্রকাশ পায়, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫৬)*।

শিরক বিশ্বের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহের কাজ এবং সেই জন্যই শিরককে চূড়ান্ত পাপের কাজ বলে গণ্য করা হয়। এটা এত বড় গুনাহ যে প্রকৃতপক্ষে একজন যতই ভাল কাজ করুক না কেন তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যায় এবং অপরাধকারীর জাহান্নামে চিরস্থায়ী নরক দণ্ড নিশ্চিত হয়ে যায়। ফলস্বরূপ মিথ্যা ধর্ম প্রধানত এই ধরনের শিরক এর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সকল ধর্ম বা প্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের অনুসারীদের সৃষ্টির পূজা করার আহবান জানায়। খৃস্টানদেরকে যিশু নামে একজন মানুষকে উপাসনা করার আহবান জানানো হয় যিনি আসলে স্রষ্টারই এক নবী; অথচ তাকে স্রষ্টার দেহধারী বলে দাবী করা হয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকরা (Catholics) মেরীকে (বিবি মরিয়মকে) স্রষ্টার মা উপাধি দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করে। তদুপরি তারা মাইকেল বা হযরত মিখাইল (আঃ) নামে ফেরেশতার উপাধি দিয়েছে সেইন্ট মাইকেলকে (St. Michael)। সেইন্ট মাইকেলকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্য তারা মে মাসের ৮ তারিখে এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখ মাইকেলমাস (Michaelmas Day) দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও ক্যাথলিকরা প্রায়ই বাস্তব অথবা কল্পিত সাধুদের কাছেও প্রার্থনা করে।

যে সব মুসলিম রাসূলের (ছাঃ)-এর কাছে প্রার্থনা করে অথবা ছূফীদের বিভিন্ন আউলিয়া এবং সাধকদের কাছে প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে এরা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেই সব মুসলিম এই ধরনের 'শিরকে আকবার' করে। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 'বল, 'তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আরোপিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? (জবাব দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও?' *(আন'আম ৪০)*।

(খ) শিরকুল আছগার (ছোট শিরক) :

মাহমুদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً 'আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল শিরকে আছগর (ছোট শিরক)।' ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন 'হে আল্লাহর রাসূল ছোট শিরক কি?' তিনি উত্তর দিলেন 'রিয়া' লোক দেখানো বা জাহির করা। কারণ নিশ্চয় শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, 'বস্তুজগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন পুরস্কার পাও কি না' *(আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হা/৫৩৩৪)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন 'আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর একটি বিষয় সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, জ্বি বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হল গুপ্ত শিরক। (অর্থাৎ) যখন কেউ ছালাত পড়তে উঠে ছালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোক তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক' *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩৩৩)*।

রিয়া

বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের মধ্যে অন্যকে দেখানোর এবং প্রশংসিত হবার জন্য যে ধরনের ইবাদতের অনুশীলন করা হয় সে ধরনের ইবাদত হল রিয়া। এই গুনাহ সকল ন্যায়নিষ্ঠ কাজের সুফল ধ্বংস করে ফেলে এবং যে এই গুনাহ সংঘটিত করে তার উপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসে। এটা বিশেষ করে ভয়ংকর। কারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রশংসা আশা করে এবং উপভোগ করে। সুতরাং লোকদের মনে দাগ কাটার জন্য অথবা তাদের প্রশংসা পাবার জন্য ধর্মকর্ম করা একটা খারাপ কাজ যা থেকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। যে সব মুমিনদের লক্ষ্য তাদের জীবনের সকল দ্বীনী কর্মকাণ্ড স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত করা তাদের জন্য এই বিপদ সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে যারা সত্যিকার মুমিন তাদের দ্বারা শিরকে আকবার (বৃহৎশিরক) সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এর অপকারিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। কিন্তু অন্য সবার মত প্রকৃত মুমিনগণ কর্তৃক রিয়া করার সম্ভাবনা বেশি কারণ এটা খুব প্রচ্ছন্ন। এটা শুধু একজনের নিয়ত পরিবর্তনের মতই সহজ কাজ। এর পিছনে প্রেরণা শক্তিও খুব প্রবল। কারণ এটা মানুষের অন্তরের স্বভাব প্রসূত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন 'চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিপড়ার চেয়েও গোপন হল শিরক' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩০)*।

সুতরাং একজনের নিয়ত সর্বদা খাঁটি রাখা এবং এমনকি কোন ন্যায় কাজ করার সময়ও খাঁটি রাখার নিশ্চয়তার জন্য অতি যত্নবান হতে হবে। এটার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ইসলামে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, যৌন কর্ম, এমনকি শৌচাগারে যাবার পূর্বে ও পরে অনেকগুলো ধারাবাহিক দু'আ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে এই ধরনের প্রাত্যহিক অভ্যাসগুলো ইবাদতের কাজে পরিণত হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে গভীর সচেতনতা প্রকাশ পায়। এই সচেতনতা হচ্ছে তাক্বওয়া যা নিয়তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখে। রাসূল (সঃ) অবশ্যম্ভাবী শিরক হতে নিরাপত্তা বিধানের কতিপয় নির্দিষ্ট দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যেসব দু'আ যে কোন সময় পড়া যেতে পারে। আবু মুসা বর্ণনা করেন, *একদিন রাসূল (সঃ) খুত্বা দেবার সময় বললেন,* أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ *'ওহে মানব সকল শিরককে ভয় কর, কারণ এটা একটা পিপড়ার চুপিসারে চলার চেয়েও গুপ্ত'। আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েকজন প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসূল! যখন চুপিসারে চলা পিপড়া থেকে গোপন তখন কিভাবে আমরা তা এড়িয়ে চলব? তিনি বললেন,* قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ 'বল "আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা আন নুশরিকা শায়আন না'লামাহু, ওয়া নাস্তাগফিরুকা লিমা লা না'লামু' (হে আল্লাহ, আমরা জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শিরক করা হতে আশ্রয় চাইছি এবং যা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই তা হতে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি) *(আহমাদ, তাবারানী, ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬)*।

দাওয়াতের পদ্ধতি

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর নবী-রাসূলগণের প্রত্যেকেই দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র যাবতীয় বিধানকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ 'আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যার হুকুম আলস্নাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; কিন্তু আমি তার হুকুম তোমাদেরকে অবশ্যই দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন; কিন্তু আমি তোমাদেরকে তা অবশ্যই নিষেধ করেছি'।[২] বর্তমানে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত নেই। তবে তিনি আমাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার দিশারী হিসাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। আর এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। এই নিবন্ধে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেওয়ার পথ ও পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াতের পদ্ধতি

মানুষ তার সার্বিক জীবনে ইসলামের বিধান পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতির অনুসরণ করবে। তিনি যে পদ্ধতিতে মানুষকে দা'ওয়াত দিয়েছেন, মানুষ ঠিক সে পদ্ধতিতে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নিম্ন সংক্ষিপ্তভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

(১) الإخلاص তথা খালেছ নিয়তে দা'ওয়াত দেওয়া : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'।[৩]

অতএব একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে হবে। দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত দিলে সেই দা'ওয়াতে সফলতা পাওয়া যাবে না এবং পরকালে তার জন্য নেকীর কোন অংশ থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٌ 'যে ব্যক্তি পরকালীন কোন আমল দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে পালন করবে, পরকালে তার জন্য নেকীর কোন অংশ থাকবে না।[৪]

(২) العلم তথা জ্ঞান সহকারে দা'ওয়াত দেওয়া : আল্লাহর পথে মানুষকে দা'ওয়াত দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যেমন- (ক) যে বিষয়ে দা'ওয়াত দিবে সে সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা এ বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে সে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল, ওয়াজিবকে সুন্নাত ও সুন্নাতকে ওয়াজিব মনে করবে এবং সেদিকেই মানুষকে আহ্বান করবে। ফলে সে নিজে পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে। (খ) যাদেরকে দা'ওয়াত দিবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন- তাদের দ্বীন, আক্বীদা, আমল ও তাদের অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তাদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালাতে হবে। (গ) দা'ওয়াতে সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- 'বল, এই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্র শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা عَلَى بَصِيْرَةٍ বলতে উল্লিখিত বিষয় সমূহের জ্ঞান অর্জনকেই বুঝিয়েছেন।

(৩) اللين তথা নম্রতার সাথে দা'ওয়াত দেওয়া : মানুষকে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় নম্রতা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ- 'আল্লাহ্র রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরপ্রাণ হতে তবে তারা তোমার থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর' *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*।

অতএব অবশ্যই নম্রতার সাথে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দিতে হবে। এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে অত্যাচারী শাসক নিজেকে আল্লাহ বলে দাবীকারী ফেরাউনকে পর্যন্ত নম্রতার সাথে দা'ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى- 'তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বহা ২০/৪৩-৪৪)*।

(৪) الحكمة তথা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাত অবলম্বন করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ- 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি-র বিধান কুরআন ও সুন্নাত।[৫]

আল্লাহ তা'আলা 'হিকমাত' শব্দটি পবিত্র কুরআন মাজীদের ১২ টি সূরায় ১৯ টি আয়াতে ২০ বার উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত 'হিকমাত' শব্দের তাফসীর নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত

---

২. সিলসিলা ছহীহা হা/ ১৮০৩; সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী হা/১৩৮২৫, ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, ১৫ পৃঃ।

৩. বুখারী হা/১, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কিতাবে অহী শুরু হয়েছিল' অধ্যায়।

৪. আহমাদ হা/২১২৬০; ছহীহ জামে' আছ-ছাগীর হা/৫১৩৬।

৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৬১৩ পৃঃ, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টাব্য।

হয়। তবে সবগুলি মতের সারকথা হল, الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيئ في موضعه ‘কথায় ও কাজ সমূহে প্রত্যেক জিনিসকে তার নিজ স্থানে স্থাপন করাকে হিকমাত বলা হয়।[৬] অর্থাৎ প্রত্যেক কথা ও কর্মকে একমাত্র অহি-র বিধানের আলোকে সঠিক প্রমাণ করা এবং তাকে বাতিলের সাথে মিশিয়ে না ফেলা।

অতএব দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নম্রতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা ও সৎকাজের আদেশের মধ্যেই ‘হিকমাত’ সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক কথা ও কর্মে হকের উপর অটল থাকা এবং সেই হককে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রয়োগ করার নাম হিকমাত। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুপাতে নম্রতা, কঠোরতা, সহনশীলতা, ভদ্রতা অবলম্বন করতে হবে। সর্বদা বাতিলের সাথে আপোসহীন হতে হবে। হিকমাতের দোহাই দিয়ে কোন ক্রমেই বাতিলের সাথে আপোস করা যাবে না। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা বাতিলের মুকাবালা করতে হবে।

(৫) একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে দা‘ওয়াত দেওয়া : আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন। অতএব মানুষ তার সার্বিক জীবন পরিচালনা করবে একমাত্র অহি-র বিধান অনুযায়ী এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে। সাথে সাথে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করবে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ– ‘সকল মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষরা যে বিষয়ে মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেন’ *(বাকারা ২/২১৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ– ‘নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব (কুরআন) ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে’ *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا– ‘আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক কর না’ *(নিসা ৪/১০৫)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ– ‘আমি তো তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ’ *(নাহল ১৬/৬৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ– ‘এটা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা উহাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে’ *(আনকাবূত ২৯/৫১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ– ‘আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত কর’ *(যুমার ৩৯/২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ– ‘আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদের তত্ত্বাবধায়ক নও’ *(যুমার ৩৯/৪১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু’টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত’।[৭]

উল্লিখিত দলীল সমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র অহি-র বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে হবে। মানব রচিত ঈমান বিধ্বংসী কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করলে সে নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করবে।

(৬) প্রথমে আক্বীদা সংশোধনের দা‘ওয়াত দেওয়া : আল্লাহ্র পথে মানুষকে দা‘ওয়াত দেওয়ার সময় প্রথমেই তাকে ছহীহ আক্বীদা তথা নির্ভেজাল তাওহীদের দা‘ওয়াত দিতে হবে। কেননা ছহীহ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমেই একজন মানুষ সত্যিকারের মুসলিম হয়। পক্ষান্তরে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে সে মুসলিম থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেলে তার ছালাত, ছিয়াম কোন কাজে আসবে না। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে শাসনকর্তা হিসাবে ইয়ামেনে প্রেরণকালে বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوْا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوْا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيْرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوْا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ–

‘তুমি যেহেতু আহলে কিতাবদের নিকট যাচ্ছ সেহেতু প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের (আল্লাহ্র একত্ব) দিকে আহ্বান করবে। যখন তারা আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদেরকে খবর দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যখন তারা ছালাত আদায় করবে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করা হবে। যখন তারা ইহাকে স্বীকৃতি দিবে, তখন তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।[৮]

পরিশেষে আল্লাহর পথে দেওয়া পৃথিবী মহত্তম কাজ সমূহের মধ্যে অন্যতম। তবে এই দাওয়াত দিতে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি মোতাবেক, নিজের খেয়াল-খুশী মোতাবেক নয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৬. সাঈদ ইবনু আলী ক্বাহতানী, আল-হিকমাত ২৭ পৃঃ।

৭. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, ‘কিতাব ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

৮. বুখারী হা/৭৩৭২।

ইসলামী খেলাফত : একটি পর্যালোচনা

-বযলুর রহমান

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের বিধান সকল যুগে সকল মানুষের জন্য চিরস্থায়ীভাবে চিরকল্যাণকর। মূলতঃ ইসলামের তাওহীদী মূল দর্শনের উপরেই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মূল ভিত। মৌলিকভাবে ইসলামী খেলাফত বিশ্বমানবতাকে এক শান্তিময় সমাজ উপহার দিয়েছে। যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখ্য যে, মানুষের সমাজ জীবনসহ তাদের সার্বিক জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত এবং শান্তিময় করার জন্য যতগুলো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ সংস্থা। আর নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব হ'ল একটি রাষ্ট্রের মূল উপাদান।

খেলাফতের পরিচয় :

'খেলাফত' (اَلْخِلَافَةُ) শব্দটি আরবী, যা اسم مصدر। خَلَفَ يَخْلُفُ اَلْخِلَافَةُ خلافة অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। বাব نصر-ينصر। মাছদার اَلْخِلَافَةُ অর্থঃ ইমারত, ইমামত, শাসন, কর্তৃত্ব প্রভৃতি। পারিভাষিক অর্থে 'আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও আইনগত কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র মৌলিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিগঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে ইসলামী খেলাফত বলা হয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'খেলাফত বলতে এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বুঝায় যা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত'। মোটকথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করার প্রতিনিধিত্বই হল খেলাফত।

পরিস্থিতি মূল্যায়ন :

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সমস্ত বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যেন মুহূর্তের ব্যাপার। তাই নিজ দেশের পরিস্থিতিকে আর বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মিয়ানমারের গণতন্ত্রের মানসকন্যা খ্যাত ও শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সূচি তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিজয়ের জয়মাল্য পরিধান করেছেন। বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত আরাকানের অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিম মানবতা। কিন্তু বিশ্বকে হতাশ ও বিমূঢ় করে ১৯৪২, ১৯৭৮ ও ১৯৯২-এর ন্যায় ২০১২ সালের ৮ই জুন সূচি'র দেশের নরপশু সদৃশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিরীহ মযলুম রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালায়। ছুটে আসে তারা আশ্রয় নেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী আমাদের মুসলিম নামধারী সরকার চূড়ান্ত অমানবিকতা প্রদর্শন করে তাদের এতটুকু আশ্রয় প্রদান করতে সম্মত হয়নি। বিশ্ববাসী এই অমানবিক নিপীড়নের মর্মান্তিক দৃশ্য অসহায়ের মত অশ্রুসজল নেত্রে অবলোকন করেছে। তাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে, মানুষের তৈরী করা বিভিন্ন মতবাদ ও তন্ত্রমন্ত্রের হোতাদের নগ্ন চেহারা কত বীভৎস। তাই সারাবিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে মুক্তির প্রকৃত সত্য পথের দিকে।

উন্নত রাষ্ট্র আর উন্নয়নশীল বিকাশমান রাষ্ট্রের (মুসলিম বা অমুসলিম) দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, বিশ্ব সভ্যতার সূচনাকারী এবং বিশ্ব মানবতার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী ও অধিকর্তা মুসলিম জাতির অবস্থা আজ অত্যন্ত করুণ। জাতিসংঘ ও ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন ও উজাড় করে চলেছে একের পর এক মুসলিম জনপদ ও দেশসমূহকে। পারমাণবিক বোমা নামক মারণাস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত অসহায় মানবতা অত্যাচার-নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট ও নিগৃহীত হচ্ছে অবিরত। অন্যদিকে চরম অনৈতিকতার বিস্তার ঘটছে তাদের চালু করা আকাশ সংস্কৃতির বিভিন্ন রকমারী আয়োজনের হিংস্র থাবায়। পাশাপাশি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল (?) রাখতে অনুসরণ করছে মস্তিষ্কপ্রসূত নানা মতবাদের। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বস্তুবাদী মতাদর্শের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে তথাকথিত মাযহাব, মতবাদ, ইযম, তরীকাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষের মতাদর্শ। এছাড়া দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় মানবরচিত আইনে মুমিনকে জেল-ফাঁসি বরণ করতে হচ্ছে। ফলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। এভাবেই সমস্ত দুনিয়া আজ মিথ্যা, অন্যায়, অকল্যাণের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ইসলামী খেলাফতের বাস্তবতা :

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ, যা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি মানবজাতির জন্য সর্বাবস্থায় চির কল্যাণকর। যার মধ্যে সকল যুগের সমস্ত মানুষের জন্য জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট ও স্থায়ী কল্যাণের পথনির্দেশ রয়েছে। যা সকলের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয় ও পালনীয়। আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত আইনবিদ এ. কে. ব্রোহী, বিশ্বনন্দিত বিচারপতি জাস্টিস কায়ানী, জাস্টিস কর্নোলিয়াস, জাস্টিস মুরশেদ, জ্ঞানতাপস ড. মুঃ শহীদুল্লাহ সকলেই মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বশান্তি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, `Islam is the fully balanced and complete coad of life' অর্থাৎ 'ইসলাম হচ্ছে একটি ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি'। কতগুলো ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়াত ও সমাধান পেশ করেছে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল প্রয়োজনীয়তা এ কারণে যে, পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে যেন ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয় এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইসলামী খেলাফতের কোন বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন মুসলমান ব্যক্তির জীবনে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে পালনের স্বাধীনতা থাকলেও বৈষয়িক জীবনে বস্তুবাদী আইনে শাসিত হতে হয়। ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণের ফলে একজন মুমিন ব্যক্তির রিযিক হারাম রিযিকে পরিণত হয়। অন্যদিকে মস্তিষ্কপ্রসূত আইনসমূহের চোরাবালিতে অসহায় ও নির্দোষ ব্যক্তিরা বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানে। অবশেষে চূড়ান্ত ফায়সালায় ফাঁসি, না হ'লে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নির্জন-নিভৃতে নীত হয়। ফলে তথাকথিত আইন মানুষের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে

অরুচিকর বিষয়ে পরিণত হয়। যার কারণে সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সুবিচারের পথ বিলুপ্ত হয়। ব্যাপকতা লাভ করে বিশৃঙ্খলা আর অস্থিতিশীলতা। আর এ সমস্ত কারণেই একজন মুসলিম সর্বদা দেশে-বিদেশে সর্বত্র ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকবে। কারণ ইসলামী খেলাফত শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং খেলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর *(প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন পৃঃ ৬)*।

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী :

বিশ্বমানবতার সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপদ জীবনের জন্য ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অত্যধিক। আর এই খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বান্দাকে কতিপয় গুণাবলী অর্জন করতে হয়। যার ফলে সমাজে ভীতির পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি পৃথিবীতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'তোমাদের মধ্যকার ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন এই মর্মে যে, তাদেরকে তিনি অবশ্য অবশ্য পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন, তিনি অবশ্য অবশ্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যার উপরে তিনি রাযী হয়েছেন মুমিনদের জন্য এবং তিনি অবশ্য অবশ্য তাদেরকে ভীতির পরিবর্তে শান্তি দান করবেন। তারা যেন আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে। যারা এর পরে কুফরী করবে (অর্থাৎ খেলাফত প্রাপ্তির উক্ত নে'মতের না-শোকরী করবে), তারা ফাসেক্ব'। 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার' *(নূর ২৪/ ৫৫-৫৬)*।

আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে মুসলমানদেরকে তিনটি বিষয়ে ওয়াদা দান করেছেন। যেখানে শেষের দু'টিকে প্রথমটির বাস্তব ফল বলা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করা (২) ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করা (৩) ভীতির বদলে শান্তি দান করা। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর এই ওয়াদা খেলাফতে রাশেদাহ্‌র ত্রিশ বছরের শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন *(ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ৪ পৃঃ)*।

আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের যথার্থতার অন্যতম প্রমাণ। আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদাহ্‌র স্বর্ণযুগে নবুওয়াতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ৫৬টি দেশে মুসলমানদের শাসন কায়েম রয়েছে। যদিও ইসলামী শাসন ও আইন বিধান অধিকাংশ দেশেই নেই। আয়াতটি কেবলমাত্র খেলাফতে রাশেদাহ বা ছাহাবায়ে কেরামের যামানার জন্য খাছ নয়। বরং সকল যুগের মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আম। সর্বযুগে পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানগণ এই শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করতে পারে *(ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন পৃঃ ৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ إِمَّا بِعِزِّ عَزِيزٍ وَإِمَّا بِذُلِّ ذَلِيلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَيَعِزُّوا بِهِ وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهُ 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা ঝুপড়িও থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না। হয় তারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে, নয় কবুল না করে অসম্মানিত হবে ও ইসলামের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হবে। এইভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করবে' *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫, মিশকাত হা/৪২, সনদ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সাথে সাথে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ تَعَالَى وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ 'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই এই (ইসলামী) শাসন পূর্ণতা লাভ করবে। এমনকি ছান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একজন সওয়ারী একাকী ভ্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে ভয় পাবে না। তবে ভয় পাবে তার ছাগল পালের উপরে নেকড়ের আক্রমণের। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়া প্রকাশ করছ' *(আবুদাউদ, হা/২৬৪৯, তাফসীর কুরতুবী ১২/২৯৯ পৃঃ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِىَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا



وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِى 'আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র পৃথিবীকে একত্রিত করে দেখালেন। আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। সত্বর আমার উম্মতের শাসন ঐ সমস্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছানো হবে, যতদূর পর্যন্ত এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আমরা এখন সেই যুগ অতিবাহিত করছি, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেন *(মুসলিম হা/৭৪৪০, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১২ পৃঃ, তাফসীরে কুরতুবী ১২/২৯৮ পৃঃ)*।

ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ

أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ ثُمَّ سَكَتَ 'তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ পাক যতদিন ইচ্ছা তা রেখে দেবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত তাদেরকে বহাল রাখবেন। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর জবর দখলকারী শাসকদের যুগ শুরু হবে। আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। এরপরে নবুওয়াতের তরীকায় পুনরায় খেলাফত কায়েম হবে। এই পর্যন্ত বলার পর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন' *(আহমাদ হা/১৮৪৩০, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫; মিশকাত হা/৫৩৭৮)*। উপরোক্ত হাদীছ থেকে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নামে ও বেনামে জবর দখলকারী শাসকদের যুগ চলছে। এরপরেই আসবে শান্তিময় ও কল্যাণময় ইসলামী সমাজ ও খেলাফত। আলোচ্য আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছে।

প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বে যেসব রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে এবং যে মতবাদের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলমান তন্মধ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভূমিকা অগ্রগামী। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত। (১) পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (২) পুঁজিবাদী অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (একনায়কতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র) *(মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ১৯৯৯, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩ পৃঃ)*। আর প্রত্যেক ইজম বা মতবাদের মধ্যে যেমন আদর্শিক স্বাতন্ত্র বিদ্যমান তেমনি কর্মপদ্ধতিতেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। পার্থক্যের ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্রবোধ একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব প্রস্ফুটিত। যেমন গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তবাদ প্রভৃতি।

গণতন্ত্র (Democracy) :

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে অমুসলিমদের কাছে স্বীকৃত। যা পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 'গণতন্ত্রের' বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কেউ একে বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করেছেন। কেউ দেখিয়েছেন একটি সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে। আবার কেউবা এটাকে বিশেষ ধরনের জীবনপন্থা (Way of life) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় বক্তব্য প্রদানের সময় প্রচলিত পুঁজিবাদী ও ধর্মহীন সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী মতবাদ 'গণতন্ত্র'-এর একটি রাষ্ট্রীয় রূপরেখার বর্ণনা দেন। যার মূল কথা ছিল, Democracy is the goverment of the people by the people and for the people. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যা, মানুষের উপর মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়' *(সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, জুন ১৯৮৩; পৃঃ ২৮৫)*। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর 'Modern Democracies' গ্রন্থে বলেছেন, 'গণতন্ত্র এমন এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীসমূহের হাতে না থেকে সমাজের সমস্ত সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকে' *(দ্বীপক কুমার আঢ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান; দিকদর্শন প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১১ : ষষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা; পৃঃ ২১৯)*। অধ্যাপক সিলী (Prof. Selley) বলেন, Democracy is a form of goverment in which every one has a share in it. অর্থাৎ 'যে সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে' *(মোঃ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা; রাজশাহী ঃ ইমপিরিয়াল বুকস, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯১; পৃঃ ৭৬)*। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশের জনগণ নিজেদের ইচ্ছামত রাষ্ট্রকে এমন একটি 'জবরদস্তী শক্তি' (Coercive power) সংগ্রহ করে দেয়, যার আনুগত্য করতে সকল নাগরিক বাধ্য থাকে। তাছাড়া 'জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস' ও 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' ইলাহী সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এই দুই মূর্তিমান শিরকী মতবাদ গণতন্ত্রের প্রাণ সদৃশ। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি কিংবা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়। সেখানে সরকার প্রধান ও জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য ভোট ভিক্ষা করতে হয় এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য বিভিন্ন কূট-কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রার্থীকে নিজেই সেই পদের একজন যোগ্য প্রার্থী বলে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতি-নৈতিকতার কোন স্থান নেই। থাকে না মানবিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের কার্যকরী কোন পদক্ষেপ। বরং নীতি বা নৈতিকতা বিরোধী সকল প্রকার কর্মকাণ্ড বিদ্যমান থাকে। এ রাষ্ট্রে মানুষকে কেবল চরম স্বেচ্ছাচার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ভোগবাদিতার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করে। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মস্তিষ্কপ্রসূত আইন দ্বারা শাসন ও বিচারকার্য পরিচালিত হয়। এখানে কোন আদর্শ ও ধর্মীয় আইন-বিধানের তোয়াক্কা করা হয় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের খেয়ালখুশি মত নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিকে পুঁজির নিরংকুশ মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক নীতি আদর্শকে সেখানে অনুসরণ করা হয় না। বরং অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য তারা সুদী কারবার অব্যাহত রাখে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন দলের হাতেই ন্যস্ত থাকে। এতে দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায় এবং জনসাধারণ ও জাতীয় স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন জাতি-গোষ্ঠি ভেদাভেদ ও গুণাগুণের বিচার করা হয় না। যে কেউই নেতা হতে পারে। এখানে মগজের সন্ধান না করে মাথা গণনা করা হয়। ফলে নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং জ্ঞানী-গুণী উভয়ের ভোটের মূল্য সমান হয়। রাতারাতি কলাগাছ ফুলে পরিণত হয় বটগাছে। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা একটা ধর্মহীন সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এখানে ক্ষমতার উৎস জনগণ বা বিশেষ কোন ব্যক্তি।

পর্যালোচনা :

আব্রাহাম লিংকন-এর সংজ্ঞায়িত গণতন্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিশ্ব মানবতা তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের দাসত্বকে কবুল করে নিয়ে তার সার্বিক জীবন পরিচালনা করবে। জীবনের বিস্তীর্ণ ময়দানে মানব রচিত বিধানের অন্ধ অনুসরণ করবে। ভুলে যাবে তাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবান্বিত ইতিহাস। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা ও একত্বকে করবে ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? মানুষের তৈরী বিধান দ্বারা মানুষ কিভাবে পরিচালিত হতে পারে? কিভাবে হক্ব ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? মানুষ কেন মানুষের গোলামী করবে? মানব রচিত বিধানের আনুগত্য করার অর্থ কি মানুষের গোলামী নয়? কেন মস্তিষ্ক প্রসূত বিধানের নিকট মাথা নিচু করবে? কখনো কি মানুষের তৈরী বিধান চূড়ান্ত সফলতা ও স্থায়ী শান্তি আনয়ন করতে পারে? কখনো কি মানুষের মাথা থেকে অভ্রান্ত সত্যের

দিকনির্দেশনা আসতে পারে? একটাই উত্তর, না। কারণ মানুষ কখনো ভুলের উর্ধ্বে নয়। ভুল করাটাই তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। সুতরাং মানুষের তৈরী বিধান দ্বারা কখনো মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু আশা করা যায় না। আর গণতন্ত্রের সকল নীতিমালা মস্তিষ্ক প্রসূত। তাছাড়া গণতন্ত্রের যাবতীয় নিয়মাবলী আদর্শিকভাবে ইসলামের সাথে পুরোপুরিভাবে সাংঘর্ষিক। বর্তমান আমাদের সম্মুখে এই অগ্নিগর্ভ বিশ্ব পরিস্থিতি তার জ্বাজল্য প্রমাণ। ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের সদস্য সংখ্যা বর্তমান ১৯৪টি। তন্মধ্যে অধিকাংশ রাষ্ট্রে এই মানবতা হরণের হাতিয়ার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। আপাত মধুর আবেশ নিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রায় প্রতিটি দেশেই জনগণের মাঝে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে চলেছে। যা ওপেন সিক্রেট!

পুঁজিবাদী অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (একনায়কতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র) :

একনায়কতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাজার হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। তার রচিত আইন হয় রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত সকল সাধারণ নাগরিকের আইন। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। রাজতন্ত্রে রাজা নিজ বাহুবলে রাজ্য জয় করেন ও নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালনা করেন। রাজা সৎ, যোগ্য ও সুশাসক হ'লে রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এমনকি রাজা ইসলামপন্থী হ'লে তাঁর দ্বারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করাও অসম্ভব কিছু নয়। বিগত দিনে এমনকি বর্তমান বিশ্বেও এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। এর বিপরীতটা হ'লে বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও বর্তমান বিশ্বে কোন রাজাই একক ইচ্ছায় দেশ চালান না। সর্বত্রই রয়েছে একটা নির্বাচিত অথবা মনোনীত মন্ত্রণাপরিষদ (*ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ১১ পৃঃ*)। উল্লেখ্য যে, অনেকে মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়াকে খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে সমর্পণ বলে মনে করে থাকেন। অথচ ইয়াযীদকে তিনি পিতৃস্নেহের বশবর্তী হয়ে মনোনয়ন দেননি। বরং তার অন্যতম কারণ ছিল তিনটি : প্রথমতঃ ইসলামী খেলাফত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো না হয়, দ্বিতীয়তঃ ইয়াযীদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ব্যতীত সকল ছাহাবীদের ঐক্যমত, তৃতীয়তঃ সমকালীন সময়ে প্রভাব বিস্তারকারী বনু উমাইয়াগণ ইয়াযীদ ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্বে রাযী ছিল না। তাছাড়া মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাবও ছিল না। যাহোক ইয়াযীদ যখন খলীফা নির্বাচিত হয়েই গেলেন তখন মু'আবিয়া জনসমক্ষে যে ভাষণ দেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সবকিছু জানো। হে আল্লাহ! যদি আমি তাকে এজন্য স্থলাভিষিক্ত করে থাকি যে, সে যথার্থভাবেই এর যোগ্য, তাহলে তুমি তাকে সফলতা দান কর। আর যদি এর মধ্যে আমার কোন পুত্রস্নেহের আতিশয্য কার্যকর থাকে, তাহলে তুমি তোমার সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও। তুমি তাকে সফল হতে দিয়ো না (*আল-বিদায়াহ-এর বরাতে ' খেলাফত ও মুলূকিয়াত ঃ একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যালোচনা' পৃঃ ৪১৫; গৃহীত : ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ১৬ পৃঃ*)। অতএব পিতা কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়াকে খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে সমার্পণ বলে মনে করা যাবে না। পরিস্থিতির বিবেচনায় মু'আবিয়া (রাঃ) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আর এটিই সঠিক।

পর্যালোচনা :

রাজতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যেহেতু রাজা বা রাণীরূপে একজন ব্যক্তির হাতে থাকে, সেকারণ এই শাসন ব্যবস্থা আদর্শিক ভাবে ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল। সুতরাং এই মতবাদের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) : বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত মানবতা বিধ্বংসী অভিশপ্ত আরেকটি মতবাদ হচ্ছে বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক সংকীর্ণ 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism)। এ জাতীয়তাবাদের হোতা ছিলেন ইটালির মুসোলীনি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিটলার। একই স্বার্থ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে একটি জাতি বলে। আর 'জাতি' ভিত্তিক মতবাদকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে। যা নির্দিষ্ট একটি জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তৈরী হয়। প্রাচীন জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক জাতীয়তাবাদের ব্যবহারিক অর্থ ও উপাদান এক ও অভিন্ন। প্রাচীন ও আধুনিক জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান মূলতঃ ৬টি। সেগুলো হল- বংশ, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক ঐক্য ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য। উল্লেখ্য, এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে ধর্ম অনুপস্থিত। মূলতঃ উপরোক্ত ছয়টি উপাদানই বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা বিশেষ স্বার্থবাদিতার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাচীন যুগে ১০৯৫ থেকে ১২৯১ খৃঃ প্রায় দু'শো বছর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের দোহাই পেড়ে খৃষ্টানরা মুসলামানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের জন্ম দিয়েছিল। তেমনি আধুনিক যুগে খৃষ্টান জাতীয়তাবাদ বসনিয়া, সোমালিয়া, ইরাক, আফগানিস্তানকে মুসলিম ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ইসরাঈল, মিয়ানমার, কাশ্মীর, শ্রীলংকায়ও ঠিক একইভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিগত সন্ত্রাস চলছে। ইহুদী জাতীয়তাবাদ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর বিগত অর্ধশত বছর ধরে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাচ্ছে ও তাদেরকে নিজ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ সংখ্যালঘু কাশ্মীরী মুসলমানসহ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপরেও অনুরূপ হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। অন্যদিকে হিন্দুদের নিম্ন জাত দলিতরা উচ্চ জাত ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিস্পিষ্ট ও নিগৃহীত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তেমনিভাবে ধর্মহীন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদই তুরস্কের দীর্ঘদিনের লালিত খেলাফত ধ্বংস করেছিল। এই ধ্বংসাত্মক মতবাদই হিরোশিমা ও নাগাসাকির ৪ লক্ষ অসহায় বনু আদমকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত করেছিল। এভাবেই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ মানবজাতির ধ্বংসাত্মক আদিম স্বার্থলিপ্সাকে প্ররোচিত করে তাকে আপন স্বার্থ চরিতার্থে পাগলপারা করে তোলে (*মাসিক আত-তাহরীক, ঐ, পৃঃ ৭, সংক্ষেপায়িত*)।

পর্যালোচনা :

মানব রচিত কোন ধর্ম বা মতবাদ কখনো চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। বিগত দিনে যত ধর্মীয় বিধান নাযিল হয়েছিল তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী ধর্ম 'ইসলাম' আগমনের পর রহিত হয়ে গেছে। বিশ্ব পরিচালনার পদ্ধতিগত নীতিমালা ইসলামেই উল্লেখিত হয়েছে। তাই ইসলাম বিশ্বধর্ম এবং সেইজন্য ইসলামী জাতীয়তাবাদই হচ্ছে বিশ্ব জাতীয়তাবাদ। আর এটা শুধু ইসলাম ধর্মেরই বিশেষত্ব যে, পারস্পরিক গর্ব ও আত্ম অহংকারে স্ফীত হয়ে মানুষে মানুষে, গোত্রে-গোত্রে বিভক্ত হওয়া ও ভেদাভেদ করা একটি জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে ইসলামে নির্দেশিত হয়েছে। অথচ তা জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান সমূহের অন্যতম। আর এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের মাধ্যমে তাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলন দেখিয়ে গেছেন। ফলে দেখা গেছে যে, মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গেলে ভূখণ্ডগত ও অঞ্চলগত পার্থক্য সত্ত্বেও তারা পরস্পরে এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, সহোদর ভাইকেও হার মানিয়ে দেয়। আবার একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করলে তাদের ব্যাপারে যে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল তা ইতিহাস বিখ্যাত। এভাবে আদর্শিক জাতীয়তাবাদকে অক্ষুণ্ণ রেখে মদীনার ইয়াহুদী-নাছারাদের সাথে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের জন্য

ঐতিহাসিক ‘মদীনা সনদ’ করতেও কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ধর্মহীন সেক্যুলার বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই ইসলামের সাথে তা সাংঘর্ষিক। অতএব এই বস্তুবাদী মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রচলিত এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছে। চলতি সময়ে এ মতাদর্শ মুসলিম বিশ্বসহ সারা বিশ্বের শাসন-পদ্ধতির মানদণ্ডরূপে বরিত হচ্ছে। অথচ ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ বলতে ধর্মহীনতা বা ধর্মবিমুখতাকে বোঝায়। অর্থাৎ ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ ঐ মতাদর্শকে বলা হয় ‘যা কোন ধর্মের অপেক্ষা রাখে না’ অথবা ‘যে মতাদর্শের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই’। ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’-কে ইংরেজীতে ‘সেক্যুলারিজম’ (Secularism) বলা হয়। Encyclopadia of Britenica- তে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from the worldliness to life on earth... ‘এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়’। *(Encyclopadia of Britanica, 15th Edn. 2002.Vol-X. p. 594).* ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর মূল কথা হল Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. অর্থাৎ ‘ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র’। *(ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পৃঃ ২৬)।* ড. আলী জারীশা বলেন, العلمانية هو فصل الدين عن الدولة ‘রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে দ্বীন তথা ধর্মকে পৃথক করা হ’ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ *(আল-ইত্তিজা-হাতুল ফিকরিইয়াহ আল-মু‘আছারাহ, ৮৩ পৃঃ)*। এক কথায় বলা যায় যে, জীবনের বিস্তীর্ণ ময়দান থেকে ধর্মকে উৎখাত করে তা কেবল ব্যক্তি জীবনে পালনীয় একটি বিষয় মাত্র বলে ধারণা ও অনুসরণ করাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে। অর্থাৎ মানুষের পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি জীবন থেকে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে মসজিদ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীন জীবন গঠনের মাধ্যম হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। একটি দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ১৮৪৬ সালে জ্যাকব হালেক ইংল্যান্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণা প্রথম প্রবর্তন করেন। যদিও চার্লস সাউথওয়েল, থমাসকুপার, থমাস পিয়ারসন, স্যার ব্রেডলে প্রমুখের মাধ্যমে এর পূর্বে ১৮৩২ সালে সারা বিশ্বে আন্দোলনটি জোরালো রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে আধুনিক গণমাধ্যম মানুষে মানুষে সম্পর্ককে স্বার্থপরতা ও আর্থিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা চারিত্রিক শুদ্ধচারিতার উপর স্থান দিয়েছে অর্থকে। পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্যকে উৎখাত করে সেখানে শুধু অর্থের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরিউক্ত বীভৎসতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইউরোপের কার্ল মার্ক্স একটি আর্থ-সামাজিক মতবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। যা মার্ক্সবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে বিশ্ব ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ‘উনবিংশ শতাব্দিতে প্রচারিত বিভিন্ন প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে মার্ক্সবাদই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মতবাদ’ *(আবদুল রশিদ মতিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত, অনুবাদ : এ কে এম সালেহউদ্দীন পৃঃ ১৪)*। এই কার্লমার্ক্স তার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, ‘এক কথায় আমি সব ধরনের ঈশ্বরকে ঘৃণা করি’। তিনি আরো বলেন, ‘ধর্ম হচ্ছে মানুষের কাল্পনিক সুখের অন্বেষা’। আরো বলেন, ‘ধর্ম একটি আফিম’। কেননা মানুষ প্রবৃত্তির পূজারী। কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সে জীবন অতিবাহিত করতে চায় না। তাই কার্লমার্ক্সের উপস্থাপিত এই ধর্মহীন মতবাদের তীব্র প্রচার-প্রপাগাণ্ডার ফলে বিশ্বময় তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত নেতৃবৃন্দদের কেউ কেউ এ কথিত নব্য হিব্রু নবী কার্লমার্ক্সের কথাকে ঐশীগ্রন্থের মত ভক্তি করতে থাকে। তারা তাকে এমন এক ইশ্বর রূপে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করেছে যে, অন্যান্য সকল ধরনের ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। *(রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত, পৃঃ ১৬)।* ফলশ্রুতিতে ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে ‘ইসলামী খেলাফত’ উৎখাত করে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের উপর পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান ও রোমান বর্ণমালা অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিষিদ্ধ করেন। আরবী আযান তুলে দিয়ে হিব্রু ভাষার আযান চালু করেন। আর এ সব নীতির বিরোধিতা করলে নিপীড়ন বা মৃত্যুদণ্ড দ্বারা দমন করতেন। তিউনিশিয়ার হাবিব বরগুইবা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে অব্যাহত রাখলেও মহিলাদের পর্দাপ্রথা নিষেধ করেন। ১৯৬১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার নামে তিউনিশীয় জনগণকে রামাযান মাসে ছিয়াম পালন না করার আহ্বান করেন। এটিই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বাস্তব ফল। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎসস্থল হল সম্পূর্ণরূপে ইহজগতমুখিতা। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পন্থাকে বাদ দিয়ে যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর, বল্গাহীন



প্রবৃত্তির ইচ্ছাভিত্তিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী এবং সর্বোপরি এটি ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকীকরণে বিশ্বাসী। সুতরাং এর সারনির্যাস হ’ল, ব্যক্তি জীবনে ধর্ম স্বীকৃত কিন্তু বৈষয়িক জীবনের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে মানব রচিত বিধান স্বীকৃত। যেকোন মূল্যে জাগতিক উন্নয়নই এর মৌলিক লক্ষ্য।

পর্যালোচনা :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দু’টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। এক : **ধর্মবিমুখতা**। মানুষ এখানে তার বিবেকের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর

তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য স্বীয় বিবেক ছাড়া অন্য কোন সত্তার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় (অর্থাৎ পরকালীন জীবনকে তারা অস্বীকার করে থাকে)। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনে ধর্ম কোনই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সকল বিষয়ের হেদায়েত এতে মওজুদ রয়েছে। দুই : **দুনিয়াপূজা।** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল রূহ হল 'দুনিয়া'। এখানে ধর্মীয় কোন কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই। যেনতেন প্রকারে দুনিয়া হাছিল হলেই যথেষ্ট। এই জন্যেই তারা জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রে আল্লাহ্র আইনের কোন প্রবেশেধিকারকে তারা তোয়াক্কা করে না। মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হয় তাদের আইন রচনার মূল ভিত্তি। যা ভুলের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামক অতি প্রাচীন এই মতবাদের মাধ্যমে আর যাই হোক 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠা হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে প্রথমে মুসলমানকে ধর্মের গণ্ডিমুক্ত করে। অতঃপর জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়িয়ে তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে। অতঃপর গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে মানুষের গোলাম বানায়। ফলে মানুষ এখন মানুষের দাসত্বের অধীনের চরমভাবে পিষ্ট হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী চলছে এই শয়তানী হানাহানির বহ্নুৎসব। সুতরাং মুসলমানের উচিত সর্বাগ্রে মানুষকে তাওহীদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। তার পরেই মানুষ সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার সুখ পাবে। মুক্তি পাবে মানবতা। *(মাসিক আত-তাহরীক ১৫ তম বর্ষ ১১ তম সংখ্যা, আগস্ট ২০১২, পৃঃ ৩৩-৩৪, দিশারী কলাম দ্রষ্টব্য)।* এটিই ইসলামী খেলাফতের মৌলিক দাবী।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় :

ইসলামী খেলাফত কেবলমাত্র ইসলামী তরীকার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শেরেকী তরীকার মাধ্যমে নয়। সুতরাং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় হ'ল দু'টি : **দাওয়াত ও জিহাদ**। কেননা পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী ও রাসূল তাদের সুদীর্ঘ জীবনে শুধুমাত্র দাওয়াতী জীবন পরিচালনা করে গেছেন। পরিধিগত তারতম্যের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দাওয়াতী মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে উদ্দিষ্ট বিষয়ের জোরালো প্রচার-প্রচারণা চালানের কোন বিকল্প নেই। নীতি, আদর্শ আর কর্মসূচী অক্ষুণ্ন রেখে জনমত সৃষ্টি করতে হয়। যাতে করে মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যা সকল আম্বিয়ায়ে কেরামগণ করে গেছেন। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তার আদর্শ প্রচার করে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদরূপী একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী তৈরী করেছিলেন। তাদের ত্যাগপুত মানসিকতায় ইসলাম একদিন মক্কা-মদীনার গন্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের কাংখিত খেলাফত। আজকের দিনেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আবারও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং প্রথমোক্তটির মাধ্যমে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চিন্তাধারায় বিপ্লব আনতে হবে। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এবং সেই সাথে যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশ ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। যেন ইসলামী খেলাফতের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে মানব জাতির সকল স্তরে স্পষ্ট ধারণা ও মঙ্গল চেতনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টির জন্য ব্যাপক বস্তুগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এজন্য ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে সীসাঢালা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এটাই হবে জিহাদের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। সমাজের প্রতিটি স্তরে, গ্রামে ও মহল্লায় যখন একদল সচেতন আল্লাহভীরু ও যোগ্য মুজাহিদ তৈরী হয়ে যাবেন এবং স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন। তখন সংখ্যায় যত নগণ্যই হৌক না কেন, আল্লাহ্র সাহায্যে তারাই জয়লাভ করবেন। এভাবে সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনকি তিনজন মুমিন একস্থানে থাকলেও তাদেরকে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *(মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬৪৭; আবুদাঊদ হা/২২৭২)* এই ইমারতের মাধ্যমে সুশৃংখলভাবে দেশব্যাপী দাওয়াত ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ধরনের সাংগঠনিক ও জিহাদী ইমারতের পথ বেয়েই একদিন জাতীয় ভিত্তিক 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। যদিও পূর্ণাঙ্গ 'ইসলামী খেলাফত' কেবলমাত্র ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের পরেই সম্ভব হবে *(ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ১৮-১৯ পৃঃ)*।

সুতরাং শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি এবং শরীয়তভিত্তিক বিশুদ্ধ আইন-কানুনসহ যাবতীয় দিক ও বিভাগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্বক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী খেলাফত ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই সর্বোত্তম ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। যেখানে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে সর্বত্র ন্যায় ও ইনছাফভিত্তিক সুবিচারের মাধ্যমে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, নারী-পুরুষসহ প্রত্যেক নাগরিকের পূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করণের বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে রয়েছে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব যে, তথাকথিত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ইসলামের স্বকীয়তা ও প্রাণসঞ্জিবনী শক্তির ক্রমবর্ধমান ধারাকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করছে। যদিও তা রকমারী বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন উপাদানে ভরপুর। প্রচলিত পাশ্চত্য পণ্ডিতদের রচিত অসংখ্য রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদসমূহ ইসলামকে অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রেখেছে। ইসলামের আদর্শবাদী চিন্তা ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ইহুদী-খ্রীস্টান সাম্রাজ্যবাদী চক্র নানা অজুহাতে অবদমিত করছে। অন্যদিকে ইসলামের নামে সামাজিক কুসংস্কার, উছূলী বিতর্ক, দলীয় বিভক্তি অখণ্ড মুসলিম উম্মাহকে আরো বহুগুণে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ফলে আজ ইসলামের পুনর্জীবনী শক্তির সমুন্নত ধারা চরমভাবে হুমকির সম্মুখিন। তারা ইসলামকে নিছক একটি আচার- অনুষ্ঠান, ভাবাবেগ ও কিছু বিশ্বাসের সমষ্টির নাম বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ইসলাম একটি জীবন্ত জীবন বিধান, জীবনের সকল অস্তিত্ব ও সমস্ত কর্মপরিসর ঘিরে এর আবর্তন। সমগ্র মানবতার আর্থ-সামাজিক নীতিমালার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাপাত ও একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এমতাবস্থায় বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির অভয়বাণী শুনাতে, স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণে, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সমস্ত নব্য জাহেলিয়াতের খড়গকে মুসলিম সমাজ থেকে উৎখাত করে সমাজের সর্বস্তরে খাঁটি তাওহীদবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচনের। আর এর জন্য বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে। তাহ'লেই মুসলিম জাতি তাদের হারানো গৌরবান্বিত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শক্তিমত্তা পুনরায় ফিরে পাবে। অর্জন করবে বিশ্ব পরিচালনার নেতৃত্ব। মানুষের আইনের পরিবর্তে আল্লাহ্র আইনই হবে মানবজীবন পরিচালনার মূল ভিত্তি। যা ইসলামী খেলাফতের মৌলিক বক্তব্য। শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা হবে জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। যার ওয়াদা আল্লাহ মুমিন বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের উপকারিতা

-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

ভূমিকা :

বান্দার জন্য ছিয়াম সাধনা করা মহান আল্লাহ্‌র এক অন্যতম নির্দেশ। আর আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি বিধানই মানবকুলের জন্য কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে ছিয়ামও মানব জাতির জন্য কল্যাণকর এক ইবাদাত। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে-'বেশী বাঁচবি তো কম খা'। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সীনা তাঁর রোগীদের তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস পালনের পরামর্শ দিতেন *(সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ৩১ ডিসেম্বর-৬ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং, পৃঃ ১১)*। মাঝে মধ্যে ছিয়াম পালন করা মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী-সেকথাই উপরের বাক্যে ফুটে উঠেছে। ছিয়াম অবস্থায় কিছু লোক ঘন ঘন থুথু ফেলেন। তাদের ধারণা থুথু গিললে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। ঘন ঘন থুথু ফেলা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। থুথুর সাথে দেহের অনেক মূল্যবান পদার্থ যেমন 'টায়ালিন' (Ptyalin) বেরিয়ে যাওয়ায় শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বদঅভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য। নিম্নে ছিয়ামের স্বাস্থ্যগত উপকার তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআলাহ।

বদ্‌হজম

মানুষের অতি সাধারণ এবং বহুল পরিচিত রোগ বদ্‌হজম। যে রোগ সাধারণত ক্ষুধার পূর্বে খাওয়া, অধিক পরিমাণে আহার করা, পরিশ্রমের পর বিশ্রামের পূর্বেই আহার করা ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত খাবার দ্রুতগতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশে নেমে আসে ফলে ঐ খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় এনজাইম সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়া করতে না পারায়, উক্ত খাদ্যের সঙ্গে সিকামে অবস্থিত জীবাণু দ্বারা গ্যাস সৃষ্টি হয়। এর ফলে পেট ব্যাথা, পেট ফাঁপা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হওয়া, বমি হওয়া, এমনকি শুরু হতে পারে ইনডাইজেসটিভ ডায়রিয়া। আর ডায়রিয়া থেকে শুরু হয় ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা। পরিণামে মৃত্যুও হতে পারে *(মর্ডাণ মেডিসিন, গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃঃ ১৯)*। ছিয়াম সাধনারত ব্যক্তি সাধারণত এসব সমস্যা থেকে বেঁচে থাকে। যা স্বাভাবিকভাবে বদ্‌হজম দূর হওয়ার প্রধান অবলম্বন।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র

ছিয়াম মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের নানাভাবে উপকার করে। ছিয়াম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে, তাকে উজ্জীবিত ও উর্বর করে। এর ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয় এবং স্নায়ুবিক অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে, সুদীর্ঘ অনুচিন্তন ও ধারণ সম্ভব হয়। যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার পথ প্রদর্শন করে এবং সূক্ষ্ম অনুকোষগুলি জীবাণুমুক্ত ও সবল রাখে *(ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, রমজান ১৪২০), ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১)*। পণ্ডিতগণ বলেছেন, Empty stomach is the power house of knowlege. 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আঁধার'। ছিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মনোসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর স্নায়ুবিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, অতিন্দ্রীয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া ঘ্রাণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হতে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়' *(অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫ ইং), পৃঃ ১৭)*।

হৃদপিণ্ড ও ধমনীতন্ত্র

ছিয়াম সাধনা হৃদপিণ্ড ও ধমনীর সচলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানব দেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমার কারণে রক্তে কলেস্টেরল (Cholesterol) বেশী থাকে। রক্তে স্বাভাবিক কলেস্টেরলের পরিমাণ হল ১২৫-১৫০ মিলিগ্রাম ১০০ মিলিমিটার সিরামে (পাজমে)। এর বেশী হলে হৃদপিণ্ড, ধমনীতন্ত্র ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মারাত্মক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্তথলিতে পাথর, বাত প্রভৃতি মারাত্মক জটিল রোগ। কিন্তু নিয়মিত ছিয়াম পালনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না এবং রক্তের কলেস্টেরলের পরিমাণ স্থিতিশীল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে *(নূরুল ইসলাম, প্রবন্ধ : সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা, মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০১, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪-৫)*। ছিয়াম পালন করার কারণে সারাদিন না খাওয়ায় এবং দীর্ঘ এক মাস এই প্রক্রিয়া চালু থাকায় তাদের শরীরে নতুন করে কোন কোলেস্টেরল জমা হওয়ার সুযোগ পায় না। বরং আগের জমাকৃত কোলেস্টেরলগুলিও ব্যয়িত হয়ে তার পরিমাণ কমে যায়। ফলে ড্রেজার দিয়ে নদী ড্রেজিং করলে সেখানে যেমন পানির প্রবাহ বেড়ে যায়, তেমনি এই শিরাগুলির রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে তারা এসব ভয়াবহ রোগের হাত থেকে মুক্তি পায় *(ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত, প্রবন্ধ : মেডিকেল দৃষ্টিতে সিয়াম, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ নভেম্বর ২০০০, পৃঃ ১০)*। তাছাড়া হৃদপিণ্ডের ধমনীসহ সকল প্রকার ধমনীতন্ত্রগুলিও স্বাভাবিক পরিষ্কার, স্বচল ও সক্রিয় রাখে।

লিভার ও কিডনী

লিভার ও কিডনী মানুষের শরীরের অন্যতম দু'টি ইঞ্জিন। যকৃত (Liver) মানব দেহের এক বৃহত্তম গ্রন্থি। যকৃতের ডান অংশের নীচে পিত্তথলি থাকে। যকৃত কর্তৃক ক্ষারিত পিত্ত জীবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। যকৃতের কার্যক্ষমতা লোপ পেলে জন্ডিস, লিভার সিরোসীস সহ জটিল রোগে আক্রান্ত হতে হয়। স্নেহ পদার্থ শোষণে পিত্তলবর্ণ অংশ নেয়। এ ছাড়াও ল্যাক্সেটিভ কাজে অংশ নেয় এবং কলেস্টেরল লিসিথিন ও পিত্তরঞ্জক দেহ হতে বর্জন জরে। *(শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেন্ট (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স, নভেম্বর ২০০২), পৃঃ ৩২)*। কিন্তু ছিয়াম সাধনার ফলে এই কার্যক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সকল অঙ্গগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। অন্যথায় ছিয়ামের অসীলায় যকৃত ৪ হতে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত স্বস্তি গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবী খুবই যুক্তিযুক্ত যে, যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। *(সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৮)*। কেননা যকৃতের দায়িত্বে খাবার হযম করা ব্যতীত

আরো পনের প্রকার কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে *(ঐ, পৃঃ ১৪৭)*। তাছাড়া যকৃত স্বীয় শক্তিকে রক্তের মধ্যে Globunin সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয় *(ঐ, পৃঃ ১৪৮)*।

অনুরূপ কিডনীও (Kidney) শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নাম। কিডনীকে জীবনও বলা হয়। কিডনী দেহে ছাকনী হিসাবে কাজ করে। যাকে রেচনতন্ত্র বলা হয়। কিডনী প্রতি মিনিটে ১ হতে ৩ লিটার রক্ত সঞ্চালন করে। রক্তের অপদ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে *(শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩০-৩২)*। ছিয়াম অবস্থায় কিডনী বিশ্রামে থাকে *(সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৯)*। কিন্তু তার রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্র

ডাঃ সলোমান তার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিধিতে মানব দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে মাঝে মাঝে ডকে নিয়ে চুল্লি হতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষিত করা যেমন আবশ্যক, উপবাস দ্বারা মাঝে মাঝে পাকস্থলী হতে অজীর্ণ খাদ্য নিষ্কাশিত করাও তেমনি আবশ্যক' *(মিশকাত, ছিয়াম পর্ব, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৬), পৃঃ ২১২)*। যকৃত ও পাকস্থলীর অবস্থান পাশাপাশি। কখনো বিভিন্ন খারাপ খাদ্যের প্রভাব যকৃতের উপর পড়ে। পাকস্থলী স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন। যার ভিতরে অনায়াসে বিভিন্ন প্রকার খাবার হজম হয়। পাকস্থলীসহ অন্যান্য অঙ্গ সক্রিয়ভাবে ২৪ ঘণ্টা কর্তব্যরত থাকা ছাড়াও স্নায়ুচাপ ও খারাপ খাদ্যের প্রভাবে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয় *(ঐ, পৃঃ ১৪৭)*। আবার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও বৃদ্ধি পায়। আর এই আয়তন বর্ধিত হওয়াতে মানুষের শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর *(শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩০-৩২)*।

কিন্তু দীর্ঘ একমাস ছিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। শরীরের অন্যান্য পেশির মত পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত বা বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন। এতে করে ক্ষয় পূরণ ও পুনর্গঠন কাজে সাহায্য করে। তাছাড়া গ্যাষ্ট্রিক জুইস এনালাইসিস করে যে এসিড কার্ভ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, ছিয়াম অবস্থায় পাকস্থলীর এসিড সবচেয়ে কম থাকে। আমরা ধারণা করি যে, ছিয়াম অবস্থায় এসিডিটি বেড়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য হল, ছিয়াম অবস্থায় এসিডিটি বাড়ে না, বরং কমে যায় এবং পেপটিক আলসার নির্মূলে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযম দীর্ঘ গবেষণা করে (১৯৫৮-১৯৬৩ পর্যন্ত) বলেন, 'শতকরা প্রায় ৮০ জন ছিয়াম পালনকারীর পাকস্থলীতে অম্লরসের এসিডিটি স্বাভাবিক। আবার প্রায় ৩৬% জনের অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক রয়েছে। প্রায় ১২% ছায়েমের এসিডিটি সামান্য বেড়েছে। তবে কারো ক্ষতির পর্যায়ে যায়নি। সুতরাং ছিয়াম পালনকারীর পেপটিক আলসার হতে পারে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা *(ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযাম, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৮-৯)*।

উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত জারিয়ার Wusasa Hospital-এর ডাক্তার E. T. Hess ১৯৬০ সালে লিখেছেন, As regards your inquiry reference cases of peptic the incidence of this disease here amongst the Africans living in a tribal manner appears to be absolutely nill. অর্থাৎ 'পেপটিক আলসার রোগীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ অঞ্চলে দেখা গেছে যে, উপজাতীয় জীবনধারায় যারা জীবন-যাপন করে তাদের মধ্যে একজনও পেপটিক আলসারের রোগী নেই' *(Scientific Indication in the Holy Quran, (Dhaka : Inlamic Foundation Bangladesh, June 1995), p. 63.)*। কারণ উপজাতীয়রা ছিয়াম পালন করত এবং মদ ও তামাকযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তাই তাদের পাকস্থলীতে কোন প্রকার জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

অগ্নাশয় ও কোষ নিয়ন্ত্রণ

অগ্নাশয় (Pancreas) মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর গ্রন্থিরসে ইনস্যুলিন (Insulin) নামক এক প্রকার হরমোন তৈরী হয়। এই ইনস্যুলিন রক্তের মাধ্যমে দেহের প্রত্যেক কোষে পৌঁছে এবং গ্লুকোজেন (Glycogen) অণুকে দেহ কোষে প্রবেশে সাহায্য করে। অন্যথায় ইনস্যুলিন তৈরী ব্যাহত হলে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে ডায়াবেটিস রোগ হয় *(শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩১)*। কিন্তু ছিয়াম সাধনার ফলে পাকস্থলী বিশ্রামে থাকে হেতু সেখানে খাদ্যরস বা গ্লুকোজ তৈরী ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে অগ্নাশয়ে ইনস্যুলিন তৈরী অব্যাহত থাকে। যার কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয় না এবং ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা সিংহভাগ কমে যায়।

দেহের কোষের (Cell) মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কোষগুলি পূর্বের চেয়ে অনেক সংকুচিত হয়। এছাড়া শরীরে বাড়তি মেদ (চর্বি) জমতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যালোরির অভাবে মেদ ক্ষয় হতে থাকে। যার জন্য স্থূলকার কমে যায় এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক সুঠাম হয়। শরীরের অধিক ভার কমানোর জন্য এটাও এক প্রকার 'থেরাপিউটিক' ব্যবস্থা *(Scientific Indication in the Holy Quran, p. 62-63.)*। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, লালা তৈরীকারী কোষগ্রন্থি, গর্দানের কোষগ্রন্থি এবং অগ্নাশয়ের কোষগ্রন্থি সমূহ অধীর আগ্রহের সাথে মাহে রামাযানের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে *(সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫০)*। আর এভাবেই ছিয়ামের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও স্থূলকার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার ওযন কমেও মানুষ দুর্বলবোধ করে না। বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সুস্থতাবোধ করে।

জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি

জিহ্বা মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ দান। জিহ্বায় অসংখ্য কোষের সমষ্টি স্বাদ নলিকা রয়েছে। এগুলি দ্বারা খাবারের বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা যায়। স্বাদ নলিকা চার ভাগে বিভক্ত। যথা- জিভের গোড়ায় ঝাল-মিষ্টি, পেছনের অংশে তেতো, দু'পাশে নোনতা, টক ও কষা। তবে জিভের ঠিক মাঝখানে কোন স্বাদ নলিকা না থাকায় সেখানে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না *(শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩৩)*। ছিয়াম সাধনায় ছায়েমের জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিগুলি বিশ্রাম গ্রহণ করে। যার দরুণ জিহ্বার ছোট ছোট স্বাদ নলিকাগুলি সতেজতা ফিরে পায় এবং খাবারের প্রতি রুচিরও প্রবলতা ফিরে আসে। তাছাড়া আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য চিবাতে, গলধঃকরণ ও হযম করতে লালা গ্রন্থিগুলি থেকে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। ছিয়াম পালনের ফলে এ রস বেশী বেশী নির্গত হয়। ফলে পাকস্থলীর হযম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি দূর হয় *(তদেব)*।

মনের প্রতিক্রিয়া

শারীরিক কতগুলি রোগ-ব্যাধির উৎসের অন্যতম কারণ হল মানসিক অশান্তি বা অমানবিক পীড়া। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, কতগুলি শারীরিক ব্যাধির কারণ হচ্ছে 'মানসিক পীড়া'। এগুলিকে পৃথক রোগ সাইকোসোমেটিক (Psychosomatic) ব্যাধি হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-হাঁপানী, গ্যাসটিক-আলসার, বহুমূত্র,

উচ্চ রক্তচাপ, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, হিপার থিরোডিজম, কোরনারী, মাসিক ঋতুর অনিয়ম প্রভৃতি।

সাধারণত মানুষ পরস্পর বিরোধী দু'টি স্বভাব, পশুত্ব ও মানবিক দিক দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির উপর যদি পশুত্বের প্রভাব বেশী পড়ে, তবে মানুষ পশুসুলভ হয়। পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশী প্রাধান্য পেলে সে আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ ও ধার্মিক হয়।

রামাযানের একমাস ছিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে The Cultural History of Islam গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে- The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellant teaching for building a good moral character. অর্থাৎ 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। এতে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষাও রয়েছে' *(নূরুল ইসলাম, প্রবন্ধ : সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা, মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০১, পৃঃ ৪)*।

নেশা পরিহারের সুবর্ণ সুযোগ

আমরা জানি ধূমপান সহ সর্বপ্রকারের মাদকতা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যার শেষ পরিণাম মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। 'ধূমপানে বিষপান' একথাটি সর্বাংশে সত্য। বরং সিগারেটের ধোঁয়া একজন অধূমপায়ী ব্যক্তির স্বাস্থ্যের বেশী ক্ষতি করে। যদিও অন্যের ক্ষতি করার কোন অধিকার কারো নেই, তথাপি ধূমপায়ী লোকেরা বাসে-ট্রেনে, লঞ্চে-স্টিমারে, অফিসে-ক্লাবে একাজটি করে থাকে সর্বদা মহা স্বস্তিতে বঙ্কিম ভঙ্গিতে ধোঁয়া উড়িয়ে। তিনি নিজে ধূমপান করেন ও অন্যের দেহে বিষপ্রয়োগ করেন। রামাযানুল মোবারাকে বাধ্যতামূলকভাবে সারাদিন ধূমপান না করায় ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে নিকোটিনের বিষক্রিয়া হতে মুক্ত থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয় *(মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০, পৃঃ ২)*। তাছাড়া যারা ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তাদের জন্য রামাযান একটি মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। ছিয়ামের এক মাসের প্রশিক্ষণ বাকী এগারটি মাসে কাজে লাগাতে পারলে চিরদিনের জন্য ধূমপান সহ সর্বপ্রকারের মাদকতা পরিহার করা সম্ভব।

শেষকথা

ছিয়াম পালনের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা কতিপয় অমুসলিম পণ্ডিতের গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে। প্রফেসর মুর পাল্ড দিল 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি'র পরিচিত নাম। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমি ইসলামী বই-পত্র অধ্যয়ন করেছি। যখন ছিয়ামের অধ্যায়ে পৌঁছলাম তখন আমি বিস্মিত হলাম যে, 'ইসলাম স্বীয় অনুসারীদেরকে এক মহৎ ফর্মুলা শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম যদি স্বীয় অনুসারীদেরকে অন্য আর কিছুই শিক্ষা না দিয়ে শুধুমাত্র এই ছিয়ামের ফর্মুলাই শিক্ষা দিত তাহলেও এর চেয়ে উত্তম আর কোন নেয়ামত তাদের জন্য হত না। আমি চিন্তা করলাম যে, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এভাবে আমি মুসলমানদের পদ্ধতিতে ছিয়াম রাখা শুরু করে দিলাম। আমি দীর্ঘদিন যাবত পেটের ফোলা (Stomach Inflammation) রোগে আক্রান্ত ছিলাম। অল্পদিন পরেই অনুভব করলাম যে, রোগ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। আমি ছিয়াম অনুশীলন অব্যাহত রাখলাম, কিছুদিনের মধ্যে শরীরে আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলাম। এভাবে চলতে থাকলে দেখতে পেলাম আমার শরীর স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং দীর্ঘ একমাস পর শরীরে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে' *(সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৩)*। একজন অমুসলিমের পরীক্ষিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যগত যে উপকার সাধিত হয় তা বর্ণনাতীত। মানুষ রামাযানের ছিয়ামের পাশাপাশি অন্যান্য নফল ছিয়ামগুলি পালন করলে এমনিতেই নানান রোগ থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

লেখক : কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি; শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তাক্বলীদের কুফল

- আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ মুসলিম সমাজের একটি জলজ্যান্ত অভিশাপ। মুসলিম জাতির দলে দলে বিভক্ত হওয়া এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিত্যাগ করে নানা ধর্মীয় মতবাদের সাথে যুক্ত হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজা। বিরুদ্ধবাদীরা যত যুক্তিই পেশ করুক না কেন, এমন একটি জাহেলী মতবাদকে ইসলাম কখনই সমর্থন করতে পারে না। ইসলাম দলীলের ধর্ম, কোন দলের ধর্ম নয়। ইসলাম জাগ্রত জ্ঞানের ধর্ম, অন্ধত্বের ধর্ম নয়। ইসলাম অভ্রান্ত সত্যের উৎস ও মানদণ্ড হিসাবে ঘোষণা করেছে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীছকে, কোন ইমাম বা পীরকে নয়। অথচ তাক্বলীদ মানুষকে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিবর্তে মূর্খতা ও অন্ধত্বের দিকে আহবান জানায়, দলীলের পরিবর্তে দলের আনুগত্য করতে শেখায়, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ধর্মনেতাদের বিধান অনুসরণে বাধ্য করে। সুতরাং তাক্বলীদ যে একটি সুস্পষ্ট জাহেলী মতবাদ এবং খাঁটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে অন্যতম মূল বাধা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিম্নে তাক্বলীদের কিছু কুফল উল্লেখ করা হল।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অমান্য করা :

মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করে *(যারিয়াত ৫৬)* তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন *(আলে-ইমরান ৩/১৯)*। ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহি দ্বারা সাব্যস্ত। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই মূলতঃ অহির বিধান। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) দুনিয়ার যাবতীয় বিধি-বিধানের অন্ধ অনুসরণ মুক্ত থেকে নিঃশর্তে ও নির্বিঘ্নে অহি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

(١) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ .

(১) 'তুমি অনুসরণ কর তাই, যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অহি করা হয়েছে। তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও' *(আন'আম ৬/১০৬)*।

(٢) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

(২) 'তোমাদের নিকট রাসূল যা নিয়ে আসেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

(٣) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

(৩) 'যখন আল্লাহ বা তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সেখানে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা পেশ করার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, (٤) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ–

(৪) মিক্বদাদ ইবনু মা'আদী কারিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি কুরআন ও তারই মত আরেকটি বস্তু (সুন্নাহ) প্রাপ্ত হয়েছি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩)*।

(٥) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. رواه في الموطأ

(৫) মালেক ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের নিকটে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তু মযবুতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; সে দু'টি বস্তু হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬)*। আলোচ্য আয়াত ও হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে পারে। এ দু'টিকে বাদ দিয়ে কারো মনগড়া কথা চোখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য করে তাক্বলীদ, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২. দলীল বিমুখতা :

তাক্বলীদের সর্বাপেক্ষা বড় কুফল হল দলীল বিমুখতা। মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি আলেম হউক বা জাহিল হউক, কুরআন ও হাদীছ হতে সরাসরি জ্ঞান আহরণ বা ফৎওয়া গ্রহণের অধিকার তার থাকেনা। তাকে স্বীয় ইমাম বা মাযহাবী ফৎওয়া অনুসারে কথা বলতে হয়। ফলে ইমামের নামে প্রচলিত অসংখ্য শিরক বিদ'আতে সে জড়িয়ে পড়ে। এই দলীল বিমুখতার ফলে প্রায় হাযার বছর পূর্বেকার বিভিন্ন কিয়াসী সিদ্ধান্ত, যার কোন কোনটি কুরআন ও হাদীছের সরাসরি বিরোধী, ইসলামের নামে মুসলমানদের উপর চাফিয়ে দেওয়া হয় এবং যা আজও চলছে *(তিনটি মতবাদ, পৃঃ ১২)*। মানুষ ভাল মনে করেই তা করছে অথচ প্রকৃত অর্থে তা ব্যর্থ আমল। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে, অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহাফ ১০৪-১০৪)*।

৩. মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বিভক্তি :

মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

(١) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

হাদীছে এসেছে–

(٢) عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللَّه فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقه إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَي جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ . رواه أحمد والترمذي

(১) 'হারিছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা এবং (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে

জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহবান জানালো সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হল। যদিও সে ছিয়াম পালন কওে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ-তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*।

(٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ–

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা হল (১) তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না (২) তোমরা এক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না (৩) তোমরা মুসলিম শাসককে সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ তা হল (১) বাজে কথা বলা (২) অত্যধিক প্রশ্ন করা (৩) সম্পদ নষ্ট করা *(ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৫, আহমাদ হা/৮৭৮৫)*। তাই মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে হবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। আর ঐক্যের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাক্বলীদমুক্ত ভাবে অহির বিধানের সামনে মাথা নত করা। কিন্তু তাক্বলীদের ফলে অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি যেমন সৃষ্টি হয় অন্ধভক্তি, তেমনি বিরোধী মতের প্রতি সৃষ্টি হয় অন্ধ বিদ্বেষ। ফলে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও দলাদলি। এক ও অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন মাযহাবী দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ হল তাক্বলীদ। ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের ইসলামী খেলাফতের নির্মম পরিণতি, ৮০১ হিজরীতে সৃষ্ট কা'বা শরীফে চার মাযহাবের জন্য চার মুছাল্লা কায়েমের বিদ'আত যা ১৩৪৩ হিজরীতে উৎখাত হয় এবং আজও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ও সামাজিক বিষয় যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ফিৎরা, কুরবাণী, জানাযা, বিবাহ ও তালাক পদ্ধতি, অযু, তাহারাত, নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক অনৈক্য বিরাজ করছে তার অধিকাংশরই মূল কারণ হল তাক্বলীদী অসহিষ্ণুতা। এক্ষণে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলিম ঐক্য কামনা করি তাহলে প্রত্যেককে যিদ ও অহমিকা ছেড়ে দিয়ে শরী'আতের আওতাধীন থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধকে বিনাশর্তে গ্রহণ করতে হবে এই একটি মাত্র শর্ত যদি আমরা পূরণ করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ পুনরায় একটি অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত হবে। বলা বাহুল্য যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সেটাই *(তিনটি মতবাদ পৃঃ ১৩)*।

৪. মুক্বাল্লিদ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না :

মুকাল্লিদ ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তা মানতে পারেনা এ কারণে যে, ঐ বিষয়টি তার মাযহাবের অনুকূলে নয়। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের উপর কোন বিদ্বানের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দানকারী ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারে না *(নিসা ৬৫, আহযাব ৩৬)*।

৫. শিরক ও বিদ'আতের উৎপত্তি :

মুকাল্লিদ এক ইমামের তাক্বলীদ করতে গিয়ে বাস্তবে অসংখ্য বিদ্বানের মুক্বাল্লিদ হয়ে পড়ে। ফলে বিনা দলীলে ফৎওয়া গ্রহণের সুযোগে ধর্মের নামে সৃষ্টি হয় রকমারি শিরক-বিদ'আত। অথচ যার নামে মাযহাবী ফৎওয়া প্রদান করা হচ্ছে, গবেষণায় দেখা গেছে যে, তিনি এসবের নাড়ী-নক্ষত্র কিছুই খবর রাখেন না। যেমন মুহাম্মাদ মুঈন সিন্ধী বলেন, وليس كل ما بنسب اليهم (أي الأئمة الأربعة) من القياسات البعيدة التي تشبه التشريع الجديد وينقل في كتب مذهبهم فهو ثابت النسبة اليهم بل أكثر ذلك او كله مما ارتكبه من غلب عليه الرأي من أتباعهم الخ 'চার ইমামের দিকে সম্বন্ধ করে মাযহাবী কিতাবসমূহে যে সকল দূরতম ক্বিয়াসী মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা নতুন শরী'আত রচনার শামিল তা প্রমাণিত নয়। বরং তার অধিকাংশ কিংবা সবটুকুই তাঁদের অনুসারীদের নিজস্ব রায় মাত্র'। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃ. ৭০২ হিঃ) বলেন, نسبة هذه المسائل الي الأئمة المجتهدين حرام 'এই মাসআলাগুলি মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি সম্বন্ধ করা হারাম' *(তিনটি মতবাদ পৃঃ ১৩)*।

৬. পারস্পারিক সম্পর্কের অবনতি :

মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে দেখা হলে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা, পরস্পর সালাম বিনিময় করা এবং মুছাফাহা করা সুন্নাত যা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করে এবং যার মাধ্যমে প্রচুর ছওয়াব অর্জিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর একত্রিত হয়ে মুছাফাহা করেন, তখন তাদের দুইজনের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়' *(আহমাদ, তিরমিযী ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। অথচ মাযহাবপন্থী মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিদের মধ্যে এমনও স্বভাব দেখা যায় যে, তারা অন্য আলেম ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সাথে সালাম, মুছাফাহা পর্যন্ত করে না এবং পরস্পর গীবত, তোহমতে সর্বদা লিপ্ত থাকে।

৭. শরী'আত গবেষণার দুয়ার বন্ধ হওয়া :

তাক্বলীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিণতি হল ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়া। যেমন বাহরুল উলূম আব্দুল আলী লাক্ষ্ণৌবী (মৃ ১২২৫ হিঃ/ ১৮১০ খৃঃ) বলেন, واما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالائمة الاربعة حتي اوجبوا تقليد واحد من هولاء علي الامة وهذا كله هوس من هو هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبأ بكلامهم– 'তারা বলেন, মুৎলাক্ব ইজতিহাদ ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এদের যেকোন একজনের তাক্বলীদ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব। অথচ এসব কথা লোকদের খোশখেয়াল মাত্র। এসবের কোন দলীল তারা পেশ করেনি এবং তাদের কথার কোন তোয়াক্কা করা যাবে না *(তিনটি মতবাদ পৃঃ ১৪)*। অতএব অনাগত ভবিষ্যতের অসংখ্য সমাধান হিসাবে ইসলামকে পেশ করতে হলে ইজতিহাদ (অর্থাৎ যুগ জিজ্ঞাসার জওয়াব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হতে বের করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো) অবশ্যই যরূরী। কিন্তু তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ হল এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।

সুতরাং কোন বিশুদ্ধতাবাদী মুসলিমের পক্ষে তাক্বলীদের মত জাহেলী পন্থার অনুসরণ করা কখনই সমীচীন নয়। এটা সুস্থ বিবেক-বিবেচনা পরিপন্থী এবং ইসলামী শরীআতের মূল চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনকি এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মানুষকে শিরকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাই ফিরকা নাজিয়া তথা 'মুক্তিপ্রাপ্ত দলে'র অন্তর্ভুক্ত হতে হলে অবশ্যই তাক্বলীদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে এবং নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

দক্ষিণ এশিয়ায় আহ্লেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(অবক্ষয় যুগ)

উত্তর ও পূর্ব ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন (৬০২-১১১৪ হিঃ/১২০৬-১৭০৩ খৃঃ) :

সিন্ধু ও মালাবার উপকূলের ন্যায় দিল্লীতে ইসলাম আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে আসেনি। বরং এখানে ইসলাম এসেছিল সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে। গযনীর শাসনকর্তা মুইয্যুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাম ওরফে সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরী (মৃঃ ৬০২/১২০৬ খৃঃ) ও তাঁর দুই সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক ও ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী-এর মাধ্যমে দিল্লী হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারত বিজয় ও দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। মুহাম্মাদ ঘোরীর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক (৬০২-৬০৪/১২০৬-৮ খৃঃ)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত মামলূক সালতানাত-এর শাসকগণ নওমুসলিম তুর্কী হানাফী ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মধ্য এশিয়া হ'তে হানাফী আলিমগণ দিল্লীতে জমা হতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাজধানী দিল্লী হতে যে ইসলাম উত্তর ও পূর্বে ভারতে প্রচারিত হয়, তা আলিমদের রায়নির্ভর ফেক্বহী মাযহাবভিত্তিক ইসলাম ছিল বলা চলে। যাতে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তুর্কী, ইরানী, আফগান, মোগল ও ভারতীয় বহু কিছু সংস্কার। ছাহাবা, তাবেঈন ও মুহাদ্দিছগণের প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে তার বিস্তর প্রভেদ ছিল। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বলেন,.....'ফিক্বহ ব্যতীত লোকেরা কুরআন ও হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ...আহলেহাদীছদেরকেও তারা জানত না। কেউ কেউ 'মিশকাত' পড়লেও তা পড়ত 'বরকত' হাছিলের জন্য আমল করার জন্য নয়, বুঝবার জন্যও নয়। তাহকীকী তরীকায় নয় বরং তাকলীদী তরীকায় ফিক্বহের জ্ঞান হাছিল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।...এই অবস্থা চলতে থাকে যতদিন না আল্লাহ পাক তাঁর খাছ মেহেরবাণীতে দশম শতাব্দী হিজরীতে কয়েকজন আলিমের মাধ্যমে ইলমে হাদীছকে পুনরুজ্জীবিত করেন।[৯]

সুলায়মান নাদভী (১৩০২-১৩৭২/১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, "তুর্কী বিজয়ী যারা ভারতে এসেছিলেন, দু'চারজন সেনা অফিসার ও কর্মকর্তা বাদে তাদের কেউই না ইসলামের প্রতিনিধি ছিলেন, না তাদের শাসন ইসলামী নীতির উপরে পরিচালিত ছিল। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন নওমুসলিম তুর্কী ক্রীতদাস। ঘূরীগণ চতুর্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত এবং মুগলগণ সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি।.....এরা ছিলেন আরব বিজয়ীদের থেকে অনেক পৃথক যাদের মধ্যে ইসলাম জীবিত ছিল। যাদের মধ্যে অনেকেই ছাহাবী ছিলেন।[১০]

ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন-'এই সময় ভারতবর্ষের আলিমদের অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যাদের সার্বিক মনোযোগ ফিক্বহের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, যা সরকারী চাকুরী লাভের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল। তাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কোন ফায়ছালা দেওয়ারও যোগ্যতা ছিলনা। হানাফী ফিক্বহের আলোকেই তারা ইসলামী শরীয়তকে বিচার করতেন। এর প্রতিকূলে হাদীছ থাকলেও তারা ভীষণভাবে তার বিরোধিতা করতেন। এ ব্যাপারে দিল্লীর হানাফী আলেমদের সঙ্গে খ্যাতনামা ছূফী মুহাদ্দিছ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তা খুবই প্রসিদ্ধ।[১১] প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার পাঠ্যসূচী হতে ইলমে হাদীছকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। খ্যাতনামা মিসরী মুহাদ্দিছ আলামা শামসুদ্দীন তুর্ক দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিল্জীর শাসনামলে (৬৯৬-৭১৬/১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) ৭০০/১৩০০ খৃষ্টাব্দে হাদীছ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারতে পদার্পন করেন। কিন্তু মুলতানে এসে তিনি জানতে পারেন যে, আলাউদ্দীন জুম'আ-জামা'আতে যোগদান করেন না। তিনি ছালাতে অভ্যস্ত নন। তিনি দুঃখিত মনে ফিরে যাওয়ার সময় আলাউদ্দীনকে একটি ছোট্ট হাদীছ-পুস্তিকা ও চিঠি লিখে যান। তাতে তিনি বলেন যে, 'আলাউদ্দীনের যামানায় আলিমগণ ফিক্বহে তা'লীম দিয়ে থাকেন। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।[১২] এই



সময়ে ভারতের ৪৬ জন শ্রেষ্ঠ আলিমের মধ্যে শামসুদ্দীন ইয়াহইয়ার (মৃঃ ৭৪৭/১৩৪৬ খৃঃ) মধ্যেই কেবল ইল্‌মে হাদীছের প্রতি কিছুটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।[১৩] সম্ভবতঃ আলিমগণ এ সময় হাদীছের অধ্যয়নের চেয়ে ফিক্বহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।

---

১. 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৩৭।

২. 'আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত' (সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ১৮৭-৯০।

৩. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৭৯। আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষৌভী (১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বর্ণিত ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ- নিযামুদ্দীন আউলিয়া 'সামা' (এক প্রকার মারফতী গান) শুনতেন ও তা মুবাহ মনে করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ইমাম গাযযালীর (১০৫৮-১১১১ খৃঃ) 'এহইয়াউল উলূমে' বর্ণিত হাদীছ থেকে দলীল নিয়েছিলেন। তবে ওটা যে মূলতঃ হাদীছ নয়, সেটা তিনি পরে বুঝতে পারেন ও মত পরিবর্তন করেন। যাই হোক হাদীছ ভেবেই তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুঘলক (১৩৮৮-৮৯)এর দরবারে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভায় প্রতিপক্ষ আলিমদের জওয়াবে সেটা পেশ করেন। এতে আলেমগণ ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেন-'হিন্দুস্তানে হাদীছের চেয়ে ফিকহের আইনগত গুরুত্ব বেশী। তাদের কেউ কেউ বললেন, 'ঐ সব হাদীছ আমরা শুনতে চাই না, যা আমাদের মাযহাবের শত্রু ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ খ্রিঃ) গ্রহণ করেছেন। তারা এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার (৮০-১৫০ খ্রিঃ) রায় তলব করেন। তখন শায়খ ব্যথিত হয়ে বলেন, 'সেই দেশে মুসলিম কতদিন টিকে থাকবে, যেদেশে একজন ব্যক্তির রায়কে হাদীছের উপরে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে? তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আমি তোমাদের কাছে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করছি, আর তোমরা আমার কাছে আবু হানিফার উক্তি দাবী করছ? *(ইলমে হাদীছ পৃঃ ৭৯, জুহুদ মুখলিছাহ (আরবী) পৃঃ ৩৮)*।

৪. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৭৩-৭৫।

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫।

উপরোক্ত রাজনৈতিক অনুদারতার সাথে সাথে হাদীছ গ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা ও অপ্রতুলতা ইলমের প্রসারে ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল। বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থের ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়কাল হতে বিষয়টি আঁচ করা চলে। যেমন-

(১) মাশারেকুল আন্ওয়ার : হিন্দুস্থানী মুহাদ্দিছ ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/১১৮২-১২৫২ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে দিল্লীতে আসে। মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৫২/১৩২৫-৫১ খৃঃ) দিল্লীতে এর একটি মাত্র কপি মওজুদ ছিল। সুলতান তার রাজকর্মচারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও 'মাশারেকুল আনওয়ার' স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিতেন।

(২) সুনানে আবুদাঊদ : সুলতান নাছীরুদ্দীন মাহমূদ (৬৪৪-৬৪/১২৪৬-৬৬ খৃঃ)-এর সময়ে প্রণীত 'ত্বাবাক্বাতে নাছীরী'-তেই সর্বপ্রথম সুনানে আবু দাঊদ হ'তে উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এতে আন্দাজ করা যায় যে, সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে উক্ত হাদীছগ্রন্থ দিল্লীতে মওজুদ ছিল। কিন্তু পরে আর সন্ধান মেলেনি।

(৩) ছহীহায়েন : সপ্তম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারীর (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে ছহীহায়েনের দরস শুরু হয়। তাঁর নিকট থেকে খ্যাতনামা ছাত্র ও জামাতা বিহারের শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০ খৃঃ) উহা প্রাপ্ত হন।

(৪) মাছাবীহ : জালালুদ্দীন বুখারী (মৃঃ ৭৮৫/১৩৮২) দিল্লীতে উক্ত কিতাব থেকে হাদীছের দরস দিতেন। বিহারের মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরীর (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০) গ্রন্থসমূহে উক্ত কিতাবের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায় যে, অষ্টম শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝি নাগাদ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬/১০৫৩-১১১৫ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ অষ্টম শতাব্দী হিজরীতে মুহাদ্দিছ আমীর কাবীর আলী বিন শিহাব হামাদানীর (৭১৪-৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) মাধ্যমে কাশ্মীরে আনীত হয়।

(৬) শারহু মা'আনিল আছার : আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মিসরী ত্বাহাভী (২৩৯-৩২/৮৫৩-৯৩৩ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সর্বপ্রথম ফীরোয শাহ তুগলকের সময়ে (৭৫২-৭৯০/১৩৫০-১৩৮৮ খৃঃ) অষ্টম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে ভারতে পরিদৃষ্ট হয়।

(৭) মিশকাতুল মাছাবীহ : অলিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তাবরেযী (মৃঃ ৭৩৭ হিজরীর পরে) সম্পাদিত ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত এই হাদীছ সংকলন নবম শতাব্দী হিজরীতে সর্বপ্রথম জৌনপুরের লাইব্রেরীতে দেখতে পাওয়া যায়।

(৮) সুনানে আরবা'আহ, বায়হাক্বী ও হাকেম : বিহারের হুসাইন বিন মুইয 'নওশাহে তাওহীদ' (মৃঃ ৮৪৪/১৪৪১ খৃঃ) স্বীয় লাইব্রেরীর জন্য হেজায হ'তে উক্ত কিতাবসমূহ আনিয়ে নেন। ফলে এইসব কিতাব ভারতবর্ষে নবম শতাব্দী হিজরীতে আগমন করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।[১৪]

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ২২৯-২৩২]

৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৫-৯৮।

বিজয়ের মৌলিক শর্ত

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ– وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ -

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(আনফাল ৪৫-৪৬)*।

ইবনুল কাইয়েম (র.) তাঁর الفروسية গ্রন্থের সমাপনী আলোচনায় এই আয়াতদ্বয় উদ্ধৃত করে বিজয়লাভের শর্ত হিসাবে ৫টি বিষয় উল্লেখ করেছেন–

(১) الثبات বা অবিচলতা।

(২) ذكر الله বা আল্লাহর স্মরণ।

(৩) طاعة الله ورسوله বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য।

(৪) عدم التنازع বা আপোসে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা, কেননা তা শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার শামিল।

(৫) الصبر বা ধৈর্য, কেননা ধৈর্যশীল ব্যক্তিই বিজয়ী। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ধৈর্যের মাঝেই বিজয় নিহিত রয়েছে'।

অতঃপর তিনি বিজয়লাভের জন্য উক্ত ৫টি শর্তকে সমানভাবে অপরিহার্য উল্লেখ করে বলেন, 'এই আয়াতে বর্ণিত ৫টি বিষয় একত্রিত হওয়ার পরই ছাহাবীগণ দেশে দেশে বিজয় লাভ করেছেন এবং মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই ৫টি বিষয়ের মধ্যে ছেদ পড়েছে এবং কোন কোন অংশ ছাড়া পড়েছে, তখন তৎসমপরিমাণে বিজয়ের হারও নেমে এসেছে' *(ইবনুল কাইয়েম, আল-ফুরুসিয়াহ, ৫০৬ পৃঃ)*।



সাক্ষাৎকার

*['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া মাদরাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী গত ২-৩ জুলাই ২০১৩ দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে মালদ্বীপ গমন করেন। মালদ্বীপ সফর থেকে ফিরে আসার পর জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন **'তাওহীদের ডাক'**-এর সহকারী সম্পাদক বযলুর রহমান]*

তাওহীদের ডাক : মুহতারাম, আপনারা গত ২ জুলাই দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে মালদ্বীপে গমন করেছিলেন। সফরটি আপনাদের কেমন লেগেছে?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সফরটি সব মিলিয়ে খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা সেখানে যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করতে পেরেছি বলে মনে করছি এবং মালদ্বীপ প্রবাসী বাঙালীরা এর একটা দারুণ সুফল ভোগ করবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : আমাদের জানামতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পক্ষ থেকে মালদ্বীপে আপনাদের এটাই প্রথম সফর। এই সফরের ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ কিভাবে হয়েছিল এবং আয়োজক কারা ছিলেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : হ্যাঁ! এটিই মালদ্বীপে আমাদের প্রথম দাওয়াতী সফর। আর এই সফরের ব্যবস্থাপনা হয়েছে সেদেশের কতিপয় প্রবাসী আহলেহাদীছ বাঙ্গালী ভাইদের মাধ্যমে। যাদের আক্বীদা ও আমল আমাদের প্রকাশিত মাসিক 'আত-তাহরীক' ও অন্যান্য বইগুলো পড়ে এবং বক্তব্য শ্রবণ করে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফীউল্লাহ-এর মাধ্যমে মালদ্বীপের কুমিল্লার প্রবাসী ভাইয়েরা সর্বপ্রথম যোগাযোগ করেন। তারা আমাকে এবং শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলকে তাদের প্রোগ্রামে দাওয়াত করলেন। পরে আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ছাহেব ভিসা সংক্রান্ত কাগজপত্র আমার কাছে চেয়ে পাঠালেন। কয়েকদিনের মধ্যে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পরিশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ ও বিদায় নিয়ে গত ২ জুলাই আমরা দু'জন মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

তাওহীদের ডাক : আপনারা সেখানে মোট কতটি প্রোগ্রাম করেছেন এবং সেখানের মানুষের আক্বীদা-আমল কেমন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : সেখানে আমাদের দুই দিন অবস্থানকালে ২টি প্রোগ্রাম হয়েছে। আমরা প্রোগ্রাম করি যথাক্রমে ২ ও ৩ তারিখ রাতের বেলায়। সংক্ষিপ্ত সময়ে দ্বীপ দেশটি ঘুরে দেখার তেমন সুযোগ হয়নি। ৩ তারিখ সকাল ৮টা থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত দেশটি সফর করি। বিভিন্ন দ্বীপে যাই। শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপরে মাগরিব ও এশার ছালাতের পরে প্রোগ্রাম শুরু হয়। উক্ত প্রোগ্রাম দু'টিতে উপস্থিতি ছিল প্রায় দেড় থেকে দুই হাযারের মত। অনুষ্ঠান দু'টি ১ম দিন ইস্কিন্দারিয়া এবং পরের দিন হিরিয়া স্কুলের এক অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ প্রবাসী আহলেহাদীছ বাঙ্গালীরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাযহাবীরাও অনেকে উপস্থিত ছিলেন বলে জেনেছি।

আক্বীদাগতভাবে স্থানীয় মালদ্বীপবাসীরা পুরোপুরিভাবে আহলেহাদীছ আক্বীদার অনুসারী। অর্থাৎ তাদের আক্বীদা বিশুদ্ধ। আল্লাহ যে সপ্তম আকাশে আছে তারা এটাই বিশ্বাস করে। আল্লাহ নিরাকার নন, তাঁর আকার-আকৃতি আছে এটাই তারা বিশ্বাস করে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা মাটির তৈরি বলে বিশ্বাস করে। আমরা মালদ্বীপের বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে বেশ কিছু আলেম ও ইমামের সাথে কথা বলেছি। কিছু বিষয়ে তাদের বুঝার ত্রুটি থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু তাদের আক্বীদা স্বচ্ছ এবং তারা সালাফী আক্বীদার মানুষ। মালদ্বীপের জনগণ সবাই শাফেঈ মাযহাবভুক্ত। তারা বুকের উপর হাত বাঁধে। জোরে আমীন বলে। অন্য কোন মাযহাবের লোক সেখানে আছে বলে মনে হল না। কেননা কেউ নাভীর নিচে হাত বাঁধছে কিংবা রফউল ইদায়েন করছে না এরকম কোন লোক দেখা গেল না। তিনদিন যাবৎ যে আমরা ঘুরলাম তাতে এর ব্যতিক্রম কিছু দেখলাম না। মালদ্বীপের জনগণ প্রায় সবাই কুরআন মাজীদ পড়তে পারে। অনেকের মুখেই শুনলাম যে, মালদ্বীপের কোন পুরুষ বা নারী কুরআন পড়তে জানে না এরকম তাদের জানা নেই। ছালাত আদায়েও তারা যথেষ্ট সতর্ক। তারা স্বাভাবিকভাবে তাদের স্থানীয় ভাষা দিবেহির সাথে সাথে ইংরেজী এবং আরবী ভাষা বলতেও অভ্যস্ত।

তাওহীদের ডাক : আয়োজকদের ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তা কেমন ছিল?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ: যারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল তারা আন্তরিকভাবে আমাদেরকে খুবই ভালবাসে এবং একেবারে অন্ধ ভক্ত বললেই চলে। তারা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল যে, আমরা কখন সেখানে পৌছব। আমরা পৌছলে তারা একেবারে বুকে বুক মিলিয়ে খুব আনন্দঘন পরিবেশে স্বাগত জানাল। প্রথমে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। অতঃপর ফ্রেশ হয়ে আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করলাম। এরপর থেকে শুরু করে বিদায় পর্যন্ত তাদের আতিথেয়তায় আমরা এতই মুগ্ধ হয়েছি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বরং আমরা দুবাইয়ে পিস টিভির আমন্ত্রণে গিয়ে যে আতিথেয়তা পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী আন্তরিক আতিথেয়তা এখানে পেয়েছি। তারা সার্বক্ষণিক আমাদের সঙ্গ দিয়েছে এবং সুবিধা-অসুবিধা দেখভাল করেছে। কোন সমস্যাই বুঝতে দেয় নি।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, হোটেলবয়রা সবাই ছিল বাঙ্গালী। যারা হোটেলের ক্যান্টিনে কাজ করছে তারাও সবাই বাঙ্গালী। অবশ্য ঐ দেশে বিভিন্ন পেশায় যারা কর্মী হিসাবে কাজ করছে তারা প্রায় সবাই বাঙ্গালী। কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, দোকানদার ইত্যাদি পেশায় যাদেরই দেখা মিলছে দেখা যাচ্ছে তারা বাঙালী। তবে কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান উর্দুভাষীও আছে। প্রোগ্রাম শেষ করে পরের দিন সকালে আমরা যখন বিমানবন্দরে আসলাম, প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে ঢুকতেই চার-পাঁচজন বাঙ্গালী দৌড়িয়ে আসল। তারা আমাদের সাথে কোলাকুলি করে বলল যে, আমরা রাতে আপনাদের প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম। আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো ছিল খুব আবেগময় ও হৃদয়স্পর্শী।

তাওহীদের ডাক : দেশের প্রায় সর্বত্রই দ্বীন প্রচারের কাজে আপনার পদচারণা রয়েছে। ইদানিং দেশের বাইরেও প্রায়ই যাচ্ছেন।

প্রবাসীদের মাঝে দাওয়াতী কাজে গিয়ে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা কি আপনার নজর কেড়েছে?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : আমি দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে ইণ্ডিয়া, দুবাই ও মালদ্বীপ গিয়েছি। হজ্জ্ব সফরে সঊদী আরব গিয়ে সেখানেও কিছু দ্বীন প্রচার করেছি। সেখানে জুম'আর খুৎবাও দিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে যেটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটা হল, যারা বিদেশে গেছে তাদের অন্তরটা নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার কারণেই স্বাভাবিক ভাবেই নরম থাকে। এ কারণেই বোধহয় ধর্মচর্চার প্রতি তাদের আলাদা একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিদেশে নানা আমল-আক্বীদার লোক দেখে তাদের মধ্যে নিজের ধর্ম সম্পর্কে অজানা বিষয়গুলো নতুন করে জানার তাকীদ সৃষ্টি হয়। এজন্যই তারা সেখানে বাঙালীদের কোন ধর্মীয় সমাবেশ হলেই খুব আগ্রহ নিয়ে ছুটে যায়। আর এই সুযোগটা নিচ্ছে মুশরিক-বিদআতী আলেম নামধারীরা। তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে দ্বীন প্রচারের নামে শিরক-বিদ'আত প্রচার করছে এবং তাদের বিভ্রান্ত বক্তব্য মানুষ শ্রবণ করছে আর গ্রহণও করছে। সে কারণে ছহীহ আক্বীদাপন্থী আহলেহাদীছ আলেমদেরকেও দেশে দ্বীন প্রচারের পাশাপাশি প্রয়োজনে দেশের বাইরেও যাওয়া একান্ত যরূরী। আমি এটাও উপলব্ধি করলাম যে, যারা প্রবাসী তাদেরকে ধর্মের কথা বললে তারা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ধর্মের কথা মেনে নিতে রাযী হয় এবং মেনে চলতে চায়। সে দেশেও অনেক আলেম-ওলামা রয়েছে যারা ধর্ম প্রচার করছেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই নিজ ভাষাভাষী আলেমদের কথা মানুষ বেশী মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং মানে। তাই সময়-সুযোগমত বিদেশের মাটিতেও আমাদের যাতায়াত করা উচিৎ। যদিও এর পিছনে আনুসঙ্গিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার বিড়ম্বনা অনেক সময় নষ্ট করে দেয় এবং নিয়মিত দারসের ব্যাঘাত ঘটায়, যা বেশ অস্বস্তিকরও।

তাওহীদের ডাক : মালদ্বীপ শহর কেমন দেখলেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : মালদ্বীপের জনবসতি তো খুবই কম। মালদ্বীপ আসলে দ্বীপেরই সমাহার। হাজারো দ্বীপ নিয়ে গড়া ছোট্ট দেশটি। দ্বীপগুলো আকারেও খুবই ছোট ছোট। একটা দ্বীপ থেকে আর একটা দ্বীপের দূরত্ব কোথাও হাফ কিলোমিটার, কোথাও এক কিলোমিটার, কোন জায়গাতে পাঁচ কিলোমিটার, দশ কিলোমিটার। ছবির মত সুন্দর একেকটা দ্বীপে হয়তো দশটা, বিশটা, পঞ্চাশটা করে বাড়ি আছে। মালদ্বীপের রাজধানী শহর মালে আমাদের এই নওদাপাড়ার সমান হবে বোধহয়। গাড়িতে বড় জোর দশ-পনের মিনিট সময় লাগে শহরটি ঘুরতে। চতুর্দিকে আমরা ঘুরেছি। অবশ্য বিভিন্ন জনের মুখে আমরা অবগত হলাম যে, অনেক দূরে একটা বড় দ্বীপ আছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় বাইশ কিলোমিটার। এছাড়া বাকি দ্বীপগুলো প্রায় সবই ছোট। একটা দ্বীপের ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, সেখান চাষাবাদ করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে এক বাঙ্গালী গিয়েছিল। সে দীর্ঘদিন থেকে কিছু চাষাবাদের চেষ্টা করছিল। তারপর কিছুদিন থেকে চলে এসেছে। মালদ্বীপে অবশ্য বিশেষ চাষযোগ্য কোন ফসল নেই। মূলতঃ ওরা চাষ করে মাছ। মাছ তারা শিকার করে। এটাই তাদের প্রধান আয়ের উৎস। তবে মালদ্বীপে নারিকেল হয় খুব। এ দুটা জিনিস তারা বিদেশেও রপ্তানী করে। আর মালদ্বীপে বহির্বিশ্বের পর্যটকদের থাকার জন্য প্রচুর হোটেল আছে। এগুলিই তাদের জীবিকার প্রধান মাধ্যম। সব মিলে মালদ্বীপ একটি মনোমুগ্ধকর দেখার মত দেশ।

অতঃপর আমরা পরের দিন সকাল ৮টায় গাড়িতে চড়ে মালদ্বীপের রাজধানী মালের চতুর্দিকে ঘুরলাম। তো সেখানে দেখলাম যে, শহরের চতুর্দিকটা পাকা করে বাঁধ দেয়া হয়েছে এবং ২০-২৫ ফুট দূরে অনেক পাথর ফেলা আছে, যাতে বড় ঢেউ এসে না লাগে। মজার ব্যাপার হল এই যে, সেখানে পানির নীচে দেখলাম ৮-১০ হাত পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেখানে মূল্যবান পাথর এবং বিভিন্ন রঙের ও বর্ণের মাছ দেখা যাচ্ছে। আর কিছু জায়গায় দেখলাম সাঁতার কাটার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে হাটার সময় মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল তো গোসল করার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খুব ভাল লাগছিল তার কাণ্ডকারখানা। অন্যদিকে দ্বীপের বিভিন্ন দিক থেকে স্টীমার আসছে। তাতে মালামাল বোঝাই। এ দেশে তেমন কিছু উৎপাদন হয় না। সব বাহির থেকে আসে। ইণ্ডিয়া থেকে বেশী মাল আমদানী হয়। তারপর সেখান থেকে আমরা স্পীড বোটে চড়ে আর একটি দ্বীপে গেলাম। দ্বীপটির নাম ছিল ভিলিঙ্গিলি। ঐ দ্বীপে ঘুরতে গিয়ে আশ্চর্যের বিষয় দেখলাম যে, দ্বীপের চারদিকে কোন বাঁধ নেই। প্রত্যেক বাড়ি থেকে দেড় হাত থেকে দুই হাত সমান বিস্তৃত হয়ে আছে বালুতট। আর তাতে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। পাকুড়সহ আরও বিভিন্ন গাছ দেখা যায়ে। সেসব গাছের নিচে অনেক দোলনা বেঁধে রাখা আছে। লোকজন দোলনায় বসে বসে দুলছে। একটা দোলনায় মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল উঠে বসে দুলতে লাগলেন। মেজবানদের জোর দাবীতে আমিও একটা দোলনায় চড়ে বসতে বাধ্য হলাম। যাইহোক আমরা এই দ্বীপটি ঘুরে সেখানে আরেকটি জিনিস দেখলাম যে, ঐসব দেশের লোক নিজে কোন কাজ করেনা। সরকার তাদের একটা ভাতা দিয়ে থাকে। কিছু কিছু লোক ব্যাবসা করে। অতঃপর বিকেলে আমরা আর এক দ্বীপে গেলাম। যার নাম ছিল হুলহুমালি। সেই দ্বীপে দেখলাম বাড়িঘর নতুন হচ্ছে। অতঃপর সেখানের একটা হোটেলে নাস্তা সেরে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। ওখানে কোন মাটির ঘর নেই। ইট পাথর দিয়ে তৈরী বিল্ডিংগুলোর উচ্চতা দশ তলা পর্যন্তও আছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতার কথা বলবেন কি?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : মালদ্বীপে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তা হচ্ছে, মালদ্বীপের মানুষের আক্বীদা সালাফী আক্বীদা। আরো আশ্চর্য অভিজ্ঞতা এই যে, মালদ্বীপের প্রত্যেক মানুষ কুরআন মাজীদ পড়তে জানে এবং তারা সবাই নিজের ভাষাসহ আরবী ও ইংরেজী ভাষাও মোটামুটি বলতে পারে।

তবে তাদের 'দিবেহি' নামক একটি মাতৃভাষা আছে। যার উচ্চারণ সাঁওতালদের মত খুব জোরে ধাক্কা খায়। আমরা সেই ভাষা বুঝিনা ও তার অক্ষরও চিনিনা। তবে দিবেহি অক্ষরের চিহ্নগুলো আরবী ভাষার অক্ষরের মত। আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্যে মসজিদগুলি লক্ষ্য করলাম। সেখানে অনেক দিন আগে মাওলানা ইবরাহীম সাহেব একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নাম মাদরাসা ত্বাইয়েবা। তবে সেটা এখন আর মাদরাসা নাই। বরং একটা মসজিদ হয়ে আছে। ত্বাইয়েবা মসজিদ খুব সুন্দর ও দুই তলা বিশিষ্ট। চতুর্দিকে কুরআন মাজীদের আয়াতগুলি সুন্দর কারুকার্য খচিত। সব মিলে একটা দ্বীনী পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় দেশটিতে। এটা আমার বিশেষ ভাল লেগেছে।

তাওহীদের ডাক : মালদ্বীপের মানুষদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন বলে আপনার নিকট মনে হয়েছে? সেখানে কোন ধরনের কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়েছে কি?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : সামাজিক অবস্থা খুবই ভাল। রাস্তা-ঘাটে শত শত মটর সাইকেল পার্ক করে রাখা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই মটর সাইকেলগুলো এভাবে রাখা কেন? তারা বলল,

এসব মটর সাইকেলের মালিকরা মটরসাইকেল বাড়ীর বাইরেই রাখে। দিন-রাত এভাবেই থাকে। মটর সাইকেল হারানোর কোন ভয় নেই। কেননা এ দেশে কোন চোর নেই। কোন হৈচৈ বা মারামারি হয় না। কোথাও কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতও নেই। দেশের মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি বা মন্ত্রীরা রাস্তায় চলাচলের জন্য কোন পুলিশের প্রয়োজন বোধ করেননা। সাধারণ একটা নিম্নমানের দোকানদার যেমন আযান হলে মসজিদে চলে যাচ্ছে, তেমনি একজন মন্ত্রী আযান হলে মসজিদে চলে যান। রাস্তায় চলার সময় বোঝাই যায়না মন্ত্রী আর সাধারণ মানুষ আলাদা। ঐদেশে কোন রিকসা, গাড়ী, বাস, ট্রেন নেই। প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে স্পীড বোট আর ট্রলার। আর তার পরে মটর সাইকেল। তারা মটর সাইকেলে ঘোরাঘুরি করে এবং মটর সাইকেলটি ট্রলারে উঠিয়ে নিয়ে আরেক দ্বীপে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে মটর সাইকেলগুলো ব্যবহার করে। কিছু দ্বীপে আমরা মটর সাইকেলে ঘুরেছি আর মালেতে আমরা একটি পার্সোনাল গাড়িতে ঘুরেছি। সেখানে অল্প কিছু প্রাইভেট গাড়ি রয়েছে। সেগুলোতে তারা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যায়।

সামাজিক বা ধর্মীয় কুসংস্কার সেদেশে নেই। সেখানে একটি কবরস্থান লক্ষ্য করলাম যেখানে কোন কবর উঁচু করা ছিলনা। কবর পাকা করার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। সেটা দেখে মনে হল ফাঁকা বালুর মাঠ। আর সামাজিকভাবে আমাদের দেশে যে কুসংস্কার আছে যেমন বিভিন্ন দিবস পালন করা, বিভিন্ন জায়গায় মনুমেন্ট বানানো, পীর, ফকীরী ইত্যাদি কোন কিছুই ওদেশে নেই। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে একেবারেই দেশটি মুক্ত। বলতে গেলে খুবই ভাল পরিবেশ। তবে নারীদের ব্যাপারে আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের নারীদের মত বোরকা পড়ে ঘুরছে। কিছু কিছু নারী আরবদের মত বোরকা পরে চলছে। তবে কম বয়সী মেয়েদের অনেকেই গেঞ্জি-টপস পরে। কম হলেও এদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতই। এই দিকটা কিছুটা দুর্বল হলেও বাকী বিষয়গুলো ভালো লেগেছে।

অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সেখানে স্কুল-কলেজ আছে প্রচুর। তবে আমাদের দেশের মত মাদরাসা তেমন একটা নেই। স্কুলগুলোতে তাদের ভাষাসহ কুরআন-হাদীছও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর উচ্চ দ্বীনী শিক্ষা লাভের জন্য তাদেরকে সাধারণতঃ দেশের বাইরেই যেতে হয়। যেমন আমরা সেদেশের ধর্মমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, ধর্মমন্ত্রী মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন।

তাওহীদের ডাক : সেদেশের বড় কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ: ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা ধর্মমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি। ধর্মমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে আমরা সেখানে আরো কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত অফিসারের সাথে কথা বলেছি। তারা আরবীতেই কথা বললেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে আরবী তাদের ভালমতই জানা। ধর্মমন্ত্রীকে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে বললাম। তিনি খুশী হয়ে বললেন, আপনাদের সাংগঠনিক কোন বইপত্র থাকলে আমরা সেই বইগুলো আমাদের ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার চেষ্টা করবো। আমরা তাবলীগী ইজতেমায় দাওয়াত দিলে তিনি খুব খুশী হলেন এবং বললেন, 'সময়সাপেক্ষে সেখানে অবশ্যই উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবো। আমি বাংলাদেশে আগেও কয়েকবার গিয়েছি। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমানের ইন্তে কালের পর তার জানাযায় আমি উপস্থিত ছিলাম। তাই তোমাদের দেশে আমি সব সময় যেতে প্রস্তুত'।

তাওহীদের ডাক : মালদ্বীপে ইসলাম প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা কেমন বলে মনে হয়েছে? স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধর্ম পালনের আগ্রহ কেমন দেখলেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : স্থানীয় জনগণ ধর্মের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং ধর্মমন্ত্রীর সাথে কথা বলে যা বুঝতে পারলাম যে, তিনি ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করার মানসিকতা রাখেন। মালদ্বীপে ইসলাম প্রচার করা খুবই সহজ। এখানে কোন বাঁধা-বিপত্তি নেই। তারা যেমন ধর্ম মানতে আগ্রহী তেমনি ধর্মের কথা শুনতেও আগ্রহী। ঐদেশে ধর্ম প্রচার করতে কোন সমস্যা নেই, বাঁধা নেই। তবে বিদ'আতী বক্তাদেরকে সরকারীভাবে খুব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। সেজন্য আমরা যাওয়ার ক'দিন পূর্বে অপর একজন বাংলাদেশী বিদ'আতী বক্তা সেদেশে উপস্থিত হলে বিমানবন্দর কাস্টমসে তাকে দীর্ঘক্ষণ আটকিয়ে রাখা হয়েছিল।

তাওহীদের ডাক : মালদ্বীপে প্রবাসী ভাইদের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কার্যক্রম কেমন দেখলেন এবং আপনাদের সফরের প্রভাব কেমন পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ : মালদ্বীপের প্রবাসী আহলেহাদীছরা আমরা যাওয়ার আগে অবশ্য সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত ছিল না। তবে তারা আমাদের বক্তব্য শুনে এবং বই-পত্রিকা নিয়মিত পড়ে। আমি আমার বক্তব্যের পর তাদেরকে বলেছিলাম, আপনাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা যাবে না, সাংগঠনিকভাবে কাজ করতে হবে। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক একটি করে বৈঠক করতে হবে। আমার কথায় তারা সাড়া দিল। অতঃপর শরীফুল ইসলামকে সভাপতি এবং কামরুল ইসলাম বিপ্লবকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন মালদ্বীপ শাখা' গঠন করি। এছাড়া আমরা সাতজনের একটা উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করি। যে কমিটিতে ফয়সাল এবং জসিমুদ্দীন নামের দুই ভদ্রলোক রয়েছেন। পরবর্তীতে জানলাম যে, তারা আরো প্রায় ৫০ জনকে নিয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করছে। দেশে ফিরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে তাদের এই তৎপরতার কথা জানালে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন এবং হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'এটাই কি আপনার জীবনে প্রথম কোন সাংগঠনিক শাখা গঠনের অভিজ্ঞতা? আপনাকে এই কাজের জন্য একটি গিফট দেওয়া হবে'। তিনি গিফট দিতে চেয়েছেন। এখনও দেননি। আমি অবশ্য গিফট নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছি। পরিশেষে তারা আমাদেরকে অনেক কিছু হাদিয়া দিল। যেমন কম্বল, মাছের নির্যাস থেকে তৈরী তেলের বৈয়ম ভর্তি চারটি কার্টুন ইত্যাদি। একটা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জন্য, একটি আমার জন্য, একটি আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের জন্য এবং অপরটি আমার শিক্ষকমণ্ডলী ও অন্যান্যদের জন্য। দেশে ফিরে জানতে পারলাম যে, আমাদের সফরের পর সেখানে খুব প্রভাব পড়েছে। যারা অন্যান্য আক্বীদার মানুষ তারাও উপস্থিত হতে না পেরে খুব আফসোস ও দুঃখ করেছে। যারা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তারা আমাদের কথাকে যথাযথ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছে এবং তারা বিশ্বাস করেছে যে, এটাই হক্ব। এটা জানতে পেরে আমাদেরও খুব ভাল লেগেছে।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক'কে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ: শুকরিয়া, বারাকাল্লাহু ফীকুম।

অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠাই আমাদের শপথ

- অধ্যাপক আকবার হোসাইন

নবুয়তের তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহেলী যুগের সকল কুসংস্কার এবং মানবতা বিরোধী মন্দ কাজগুলোর উচ্ছেদ সাধনে নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তিনি ছাহাবাদের নিকট থেকে মন্দ কাজ বর্জন ও সৎ কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। বর্তমানে জাহেলিয়াতের অত্যাধুনিক রূপ সমাজে চলমান এবং এর গতিধারা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও দলের নেতার কাছে শপথ গ্রহণ করছে। জাহেলিয়াতের মুকাবেলায় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের অহির বিধান প্রতিষ্ঠার শপথও চলমান আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

শপথের পরিচিতি :

আরবী 'বায়'আত' (بيعة)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার করা, চুক্তিবদ্ধ হওয়া, শপথ করা, বিক্রি করা। পরিভাষায় নির্দিষ্ট কাজের উপর নেতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বায়'আত বা শপথ বলে। কারো কারো মতে- কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তার কথা পালনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে বায়'আত বলে। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ কী চমৎকার কথাই না সেদিন বলেছিলেন, * نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا 'আমরাতো তারাই যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করেছি জিহাদের উপর, যতদিন আমরা জীবিত থাকব'।

আদর্শ প্রতিষ্ঠার শপথ :

বীজ যত উন্নত হয়, ফসল তত ভাল হয়। মানুষের নিয়ত বা সংকল্প



যত ভাল ও দৃঢ় হবে তার কর্মফল তত বেশী ভাল ও সুন্দর হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(ছহীহ বুখারী হা/১)*। তাই শপথকে পোক্ত করার জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত আবশ্যক। সে জন্য রাসূল (ছাঃ) কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ছাহাবীদের নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করতেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ رَهْطٍ فَقَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِى فِى مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছা.)-এর নিকটে তাঁর ছাহাবীদের একটি জামা'আতসহ আমি বায়'আত করেছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে শপথ কর যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ দিবে না যা তোমরা পরস্পরে তোমাদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে দিয়ে থাক এবং তোমরা সৎ কাজের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা করবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পূরণ করবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে আল্লাহ্র নিকটে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে কোনটা করবে না তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হবে। তখন এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। এছাড়া যে এ এগুলোর সাথে জড়িত হবে আল্লাহ তা গোপন রাখবেন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন আবার তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর কাছে এর উপর শপথ করলাম *(ছহীহ বুখারী হা/১৮, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৫৮, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০; মিশকাত হা/১৮)*। উক্ত হাদীছে বর্ণিত ৬টি শর্তে নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে রাসূল (ছাঃ) মদীনা হতে আগত ১২ জন ব্যক্তির শপথ গ্রহণ করেন। এটা আক্বাবার প্রথম শপথ। এই শর্তগুলো ছিল সব ব্যক্তিগত। আক্বাবার দ্বিতীয় শপথে মোট ৭৩ জন অংশগ্রহণ করেন। সেখানে রাসূল (ছাঃ) মোট পাঁচটি বিষয়ে সামাজিক কাজের উপর বায়'আত গ্রহণ করেন।

فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلاَمَا نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُوْنِىْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا فِى اللهِ لاَ تَخَافُوْنَ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوْنِىْ فَتَمْنَعُوْنِىْ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকট কিসের উপর বায়'আত করব? তিনি বললেন, (১) তোমরা আমার নিকট বায়'আত করো সন্তুষ্টি ও অলসতায় কথা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করবে, (২) সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে (৩) সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে, (৪) আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলবে তাতে তোমাদেরকে যেন নিন্দুকের নিন্দা পাকড়াও না করে এবং (৫) আমি যখন ইয়াছরিব (মদীনায়) আগমন করব তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর তোমরা আমাকে অনুরূপ নিরাপত্তা দিবে যেমন নিরাপত্তা দাও তোমাদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে। তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০১২; মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৬৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭)*। হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে নিম্নরূপ এসেছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

উবাদা বিন ওয়ালী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, সচ্ছল-অসচ্ছল ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় আপনার কথা শুনব ও মেনে চলব, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দিলেও, আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না এবং আমরা যেখানেই থাকি হক্ব কথা বলব আল্লাহ্র জন্য নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না *(ছহীহ মুসলিম হা/৪৮৭৪; মিশকাত হা/৩৬৬৬)*।

আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে তাঁর যমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী অপরিহার্য। উক্ত হাদীছগুলোতে তাই প্রতিভাত হয়েছে। আর একাজ যে একাকী সম্ভব নয় তাও পরিষ্কার হয়েছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) সকলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ সংঘবদ্ধ ভাবে শরী'আত পালনের নির্দেশ দান করেছেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না *(আলে-ইমরান ১০৩)*। রাসুলুল্লাহ (ছা.) জামা'আতবদ্ধ যিন্দেগীর বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বলেন,

عَنِ الْحَارِث الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَة وَالسَّمْع وَالطَّاعَة وَالْهِجْرَة وَالْجِهَاد فِى سَبِيْلِ اللَّه فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَة قِيْدَ شِبْر فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقه إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ مِنْ جُثَاء جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّه وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم.

হারিছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। যথা: ১. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ২. আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা ৩. তার আনুগত্য করা ৪. হিজরত করা ও ৫. আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হল। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহিলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানায় সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪, হাদীছ ছহীহ)*।



উক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ অনুগত এবং ঐক্যবদ্ধ একটি আপোসহীন কাফেলা শর্ত, যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

মতবাদ প্রতিষ্ঠায় শপথ : আহলেহাদীছ সমাজের পরিণতি :

১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এদেশে ৯০% লোক মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মানব রচিত অসংখ্য মতবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাক্বলীদ এমন একটি মতবাদ যা একজন মুসলমানকে খোলা মনে ইসলামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। এটি আবার দুই প্রকার। যথা : ১. জাতীয় তাক্বলীদ, যা মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুসরণকে বুঝায় ২. বিজাতীয় তাক্বলীদ, যা বৈষয়িক ব্যাপারে নামে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। উক্ত মতবাদ সমূহ সবই জাহেলিয়াত। আর এই জাহেলী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এর হিংস্র ছোবলে আহলেহাদীছ সমাজ আক্রান্ত। কারণ আহলেহাদীছ ঘরে জন্ম নিয়ে প্রগতির স্রোতে নিজের মেধা, শ্রম ও অর্থ, প্রতিভা সবকিছু জাহেলী মতবাদের পিছনে ব্যয় করছে।

ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি আবেদন :

দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের অবস্থা আমাদের সকলের নিকট পরিষ্কার। হক্ব ও বাতিলের বর্তমান প্রেক্ষাপট জাতিকে সত্যিকারর্থে ভাবিয়ে তুলেছে। এমনকি প্রতিটি সেক্টরে ইসলাম অপমাণিত হচ্ছে, সুন্নাতের অনুসারীরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে তোয়াক্কা না করে শয়তানের দোসররা নিজেদের মনগড়া বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। তবে শয়তানের কর্ম কৌশল দূর্বল। এমতাবস্থায় ইসলামকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য একদল প্রতিভাবান, মেধাবী, কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছাত্র ও যুব সমাজকে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ আহ্বান জানাচ্ছে। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যখন কোন যুবককে দেখতেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে 'মারহাবা' জানাতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলেহাদীছ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৬১)*।

বিশ্বের সর্বাধিক আহলেহাদীছ এ দেশে বসবাসরত। সুতরাং হে আহলেহাদীছ ছাত্র ও যুবক সমাজ! আমরা যদি চীন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাকায় তাহ'লে দেখতে পাই একদল যুবক বিজয় সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে শপথ করেছিল এবং তাদের সেই দৃঢ় শপথ ও ইস্পাত কঠিন মনোবলের ফলে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। আজও যদি আহলেহাদীছ ছাত্র ও যুবকরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে শপথ করে তাহ'লে মানব রচিত বিধান বাংলার যমীন থেকে চির বিদায় নিবে এবং আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। যত বাঁধায় আসুক সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ আমাদের সব কিছুই তো আল্লাহ্র জন্য। এ মর্মে আল্লাহ বলেন- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'হে নবী (ছাঃ) আপনি বলুন! নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই জগৎ সমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ১৬২)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব অন্যের ঘরে আর নয় ফিরে আসুন নিজের ঘরে। আসুন! অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ করি। আমরা আমাদের সময়, শ্রম, অর্থ এ পথেই ব্যয় করি এবং পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এ প্রত্যয়কে কবুল কর- আমীন!

[লেখক : প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা ডিগ্রী কলেজ, যশোর]

মিসরের রাজনৈতিক বিপর্যয় ও গণতন্ত্রের প্রতারণা

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

২০১২ সালের ২৪ জুন মিসরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে ইসলামপন্থী দল ইখওয়ানুল মুসলিমীন বা মুসলিম ব্রাদারহুড। ৩০ জুন ক্ষমতারোহণ করেন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের রাজনৈতিক শাখা জাস্টিস এন্ড ফ্রীডম পার্টির নেতা ডঃ মুহাম্মাদ মুরসী ঈসা আল-আইয়াত্ব (১৯৫১-)। উপনিবেশবাদ উত্তর মিসরে দীর্ঘ ৬০ বছরের (১৯৫২-২০১২ইং) স্বৈরশাসন ও সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে এই প্রথম সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 'আরব বসন্তে'র উত্থানপর্বের শুরুতেই ২০১১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী হোসনী মোবারকের পতনের মাধ্যমে এই নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হয়। আর সে নির্বাচনে বহু কাংখিত জয়ের মুখ দেখতে সক্ষম হয় সমকালীন মুসলিম বিশ্বে রাজনীতির ময়দানে সবচেয়ে সক্রিয় ইসলামী সংগঠন 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' বা 'মুসলিম ব্রাদারহুড'। ১৯২৮ সালে জন্ম নেয়া এই সংগঠনটির সুদীর্ঘ ৮০ বছরের আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ফসল হিসাবে তাদের এই রাজনৈতিক বিজয় বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেয়। এর আগে তাদেরকে বছরের পর বছর ধরে মোকাবিলা করতে হয়েছে সরকারী যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুর সাঁড়াশী আক্রমণ। এমনকি হোসনী মোবারকের পতনের মুহূর্তেও সংগঠনটি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সে কঠিন পরিস্থিতিকে তিলে তিলে মোকাবিলা করে মিসরীয় প্রেক্ষাপটে এমন একটি রাজনৈতিক অবস্থান গড়ে তোলাটা খুব সাধারণ কাজ ছিল না। কেননা মিসরীয় জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশসাধনে সরকার এবং সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর বেপরোয়া পদক্ষেপের বিপরীতে প্রতিনিয়ত তাদেরকে দিতে হয়েছে চরম পরীক্ষা। অবশেষে ইসলামপন্থী ও ডানপন্থীদের নিরংকুশ সহযোগিতায় তারা চূড়ান্ত সাফল্যের মুখ দেখে। তাদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও, যারা আধুনিক যুগে 'গণতন্ত্র'কেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় মনে করে বছরের পর বছর ধরে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

ব্রাদারহুডের এই বিজয় 'মডারেট', 'কনজারভেটিভ' সকল চিন্তাধারার মুসলমানদের মধ্যে আত্মপ্রসাদ ও প্রশস্তির পরশ বুলিয়ে দিলেও একইসাথে সচেতন মহলে পুরোনো একটি আশংকার দানাও যে বেঁধে উঠেনি তা নয়। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইসলামী দলসমূহ গণতন্ত্রের পপুলার ভোটের মাধ্যমে বিজয়লাভের বিরল অভিজ্ঞতা যতবারই লাভ করেছে ততবারই শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় আসতে পারে নি বা আসতে দেয়া হয়নি। তবে এবারে যেহেতু 'আরব বসন্তে'র এক অচিন্তনীয় প্রবল ধাক্কায় মিসরের প্রতাপশালী স্বৈরশাসকের পতন ঘটেছিল এবং গণতন্ত্রের জন্য একটা জাতীয় মতৈক্য গড়ে উঠেছিল, তাই 'ব্রাদারহুড'কে আলজেরিয়ায় ১৯৯১ সালে নির্বাচিত 'ইসলামিক স্যালভ্যাশন ফ্রন্ট' বা ফিলিস্তীনে ২০০৬ সালে নির্বাচিত 'হামাস'-এর মত বিজয়লাভের পরও ক্ষমতায় বসতে না পারার দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে-এমনটা প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়নি।

যাইহোক অনেক জল্পনা-কল্পনা মাড়িয়ে অবশেষে 'মুসলিম ব্রাদারহুড' ক্ষমতায় বসার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হল। বরাবরের মত পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ মহল প্রমাদ গুণল। তবে তাদেরই রফতানীকৃত গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ায় ব্রাদারহুডকে তারা প্রাথমিকভাবে মুখ রক্ষার্থে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা কঠোর নজরদারি শুরু করল। সেক্যুলার গণতন্ত্রকে মূলমন্ত্র বানিয়ে ক্ষমতায় আসা ইসলামপন্থী 'ব্রাদারহুড' যেন কোনক্রমেই ইসলামের নাম না উচ্চারণ করতে পারে সে জন্য লক্ষে-অলক্ষে সতর্কবাণী দেয়া শুরু করল। আর 'ব্রাদারহুড'ও অত্যন্ত সাবধানতা ও 'হেকমতে'র সাথে ঝুঁকিমুক্ত পথ অবলম্বনের নীতি অনুসরণ করতে লাগল। এজন্য ক্ষমতায় বসতে না বসতেই 'ব্রাদারহুড' নেতা মুহাম্মাদ মুরসী পশ্চিমা বিশ্বকে আশ্বস্ত করে ঘোষণা করলেন, He respect all international agreements অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে ইসরাইলের সাথে কৃত শান্তিচুক্তিসহ সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিকে তিনি শ্রদ্ধার সাথে অটুট রাখবেন *(The guardian, 25 Jun 2012)*। অক্টোবর ২০১২ সালে তিনি ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট শিমন পিরেজের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি দিলেন যেখানে তিনি ইসরাঈলকে সম্বোধন করেছিলেন "a great and good friend" হিসাবে। সে চিঠিতে ইসরাঈলের সাথে পূর্ব সম্পর্ক অব্যাহত থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরো লিখেছিলেন, "maintaining and strengthening the cordial relations which so happily exist between our two countries." একই চিঠির শেষভাগে তিনি ইসরাঈলের জন্য "highest esteem and consideration" প্রকাশ করেছেন *(The Times of Israel, 27 October 2012)*। এভাবে মুসলিম বিশ্বের জানি দুশমন ইসরাঈলকে খুশী রাখার সাথে সাথে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি কূটনৈতিক আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারেও মুহাম্মাদ মুরসী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কোন রকম ত্রুটি না রাখার। এখান থেকে বোঝা যায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী অন্যান্য দেশের ইসলামী দলগুলোর অভিজ্ঞতা 'মুসলিম ব্রাদারহুড' খুব ভালভাবেই স্টাডি করেছিল এবং দীর্ঘ সংগ্রামের পর অর্জিত এই সফলতাকে ধরে রাখতে যে কোন প্রকার স্বার্থ বিসর্জন দিতে তাদের দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হল না। কেননা পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থবাদ কখনই কামনা করে না ইসলামের নাম কখনও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে উচ্চারিত হোক। ধর্মের মত 'অপাঙক্তেয়' ও 'সাম্প্রদায়িক' বিষয় কোন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অংশ হতে পারে-এটা তারা ঘূণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে না। তাই 'ব্রাদারহুড'-এর 'মডারেট' ইমেজ বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা কিংবা তাদের কর্মকাণ্ডে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সর্বোচ্চ নমুনা প্রতিফলিত হওয়া পশ্চিমাদের কখনই আশ্বস্ত করতে পারেনি। বরং তাদের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে থাকা ইসলামী লেবেলটাই তাদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে এবং এটাকে তারা সর্বদাই নিজেদের জন্য হুমকি হিসাবে নিয়েছে। তাই নির্বাচনের পর পশ্চিমা বিশ্ব মুখে শুষ্ক হাসি বজায় রেখেছে বটে, কিন্তু মিছরির ছুরি নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সর্বক্ষণ। তাদের জন্য সেই মস্ত সুযোগ এনে দেয় মুরসির ক্ষমতারোহনের ঠিক একবছর পর ৩০ জুন মিসরের তাহরীর স্কয়ারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ। বিগত নির্বাচনে পরাজিত ধর্মনিরপেক্ষ আহমাদ শফিক ব্লকের আয়োজিত এই বিক্ষোভ সমাবেশের পরদিন ১ জুলাই পশ্চিমা বিশ্বের ইশারা পেয়ে সেদেশের সেনাবাহিনী কালবিলম্ব না করে মুরসী সরকারের প্রতি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেয়। ২ জুলাই প্রেসিডেন্ট মুরসী স্বাভাবিকভাবেই এই

আল্টিমেটাম প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর ৩ জুলাই সেনাপ্রধান আব্দুল ফাতাহ আল-সিসি প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসীর পদচ্যুতি ঘোষণা করে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আদলী মনসূরের নাম ঘোষণা করেন। এভাবেই পশ্চিমা নীল নকশা মোতাবেক পতন ঘটল ইসলামপন্থী ব্রাদারহুড সরকারের। দৃশ্যপটে দেখা গেল মাত্র একবছর পূর্বে যে জনগণ সেনাশাসনের বিরুদ্ধে সারা মিশর কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং লৌহকঠিন স্বৈরশাসক হোসনী মোবারককে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল, সেই একই জনগণ সেনাবাহিনীর ক্ষমতা পুনর্দখলে বন্য উল্লাসে মেতে উঠেছে। যেই আমেরিকা সারাবিশ্বে গণতন্ত্রের কলরব তুলে মুখে ফেনা তুলে দিচ্ছে সেই আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি মিসরীয় সেনাবাহিনীর এই অবৈধ ক্ষমতাদখলের কোন নিন্দা করলেন না, এমনকি একে 'সেনা অভ্যুত্থান'ও বললেন না। উপরন্তু ঘোষণা করলেন যে, সেনাবাহিনী 'গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা' করেছে (!)। যেই মিডিয়া মোঘলরা মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র নেই বলে মাতম করে আকাশ-বাতাস উজাড় করে আসছে, সেই মিডিয়া মোঘলদের কণ্ঠে শোনা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত সুর (!)। এভাবে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রসেবীদের নগ্ন প্রতারণা বিশ্ববাসীর সামনে আরো একবার ধরা পড়ে গেল।



মিসরে গণতন্ত্র উচ্ছেদের পর পশ্চিমাদের বক্তব্য, মুরসী সরকার ছিল অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত , এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ। তাই তাদের পতনের বিকল্প ছিল না। তাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ কথাই বলতে হয় যে, কেবল মুরসী কেন, স্বয়ং ইমাম মাহদীও যদি এখন বিশ্বে আবির্ভূত হতেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন করতেন তবুও তাঁকে অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিদায় করা হত। কারণ তাদের কাছে মূল সমস্যা তো এখানে নয়, সমস্যা হল ইসলাম। অভিযোগটি যদি অদক্ষতা ও দুর্নীতিরই হত তবে তা নিরসনের জন্য মাত্র ১টি বছর সময় কি খুব বেশী ছিল? এত সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণে কি একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়? কোন যুক্তিতেই এটা সমর্থনযোগ্য? তবুও সারা বিশ্ব এই অন্যায়ের পক্ষে সরব কিংবা মৌন স্বীকৃতি দিয়েছে। তার কারণ একটাই–'ইসলাম ঠেকাও'।

মজার ব্যাপার হল, স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সামরিক হস্তক্ষেপের নতুন নিয়ম ও ধারার সঙ্গে মিল রেখে মিসরের সামরিক বাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা নেয়নি। নব্বইয়ের দশকের পূর্ববর্তী ইতিহাসে দেখা যায় এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যখন কোন সামরিক অভ্যুত্থান হত, তখন তার প্রতি পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন সমর্থন প্রায় খোলামেলা ছিল। নতুন সামরিক শাসকরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে রাজনৈতিক প্রশ্রয় পেত। তাদের জন্য মার্কিন অর্থনৈতিক-সামরিক সহায়তার নিশ্চয়তা থাকত। তখনকার আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে এসব সামরিক শাসক মার্কিন সমর্থক বনে যেত। কিন্তু বর্তমান যুগে সামরিক শাসনের প্রতি শক্তিশালী বিরোধিতা থাকায় সামরিক বাহিনী সরাসরি শাসনক্ষমতা হাতে নেয় না। রাজনীতিকদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়ে পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মিসরের বেলায় এবার তা-ই ঘটল। বাকি বিশ্বে নিজেদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য পাশ্চাত্য বিশ্ব এভাবে একবার স্বৈরতন্ত্রকে, আরেকবার গণতন্ত্রকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করে চলেছে। এমনকি ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে মিসর সেনাবাহিনীর নারকীয় আক্রমণে সারা মিসরে যে হাযার হাযার মানুষের রক্তের বন্যায় ভেসে গেল তবুও 'মানবতার পক্ষে সদা সোচ্চার' (!) পশ্চিমাদের মুখে কোন রা নেই। একদিকে তারা রক্তপাত এড়ানোর লোকদেখানো পরামর্শ দিচ্ছে, অন্যদিকে ঠিকই সেনা সরকারকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে।

মিসরে পশ্চিমাদের এই বর্বর মুনাফেকী নীতি, গণতন্ত্র নামক হাওয়াই মিঠাইয়ের সুচতুর প্রতারণা, মুরসির শোচনীয় পতন কিংবা নিরস্ত্র ব্রাদারহুড সমর্থকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নির্মম রক্তপাতের বেদনাদায়ক ইতিহাস বহু শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে যে সকল ইসলামী দল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি করেন কিংবা গণতন্ত্রকে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি মনে করেন তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এটা এক বিরাট ধাক্কা। এই ধাক্কা খাওয়ার পর গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। মিসরে গণতন্ত্রের জাজ্বল্যমান প্রতারণার উদাহরণ দেখার পরও যেসব ইসলামপন্থী গণতন্ত্রের নাম মুখে আনবেন তারা নিঃসন্দেহে আত্মপ্রতারণা করছেন কিংবা জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেন।

মূলতঃ মিসরে বছর দুয়েক ধরে যা কিছু ঘটছে এবং গত জুলাই-আগস্টে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয় পরিলক্ষিত হল তা থেকে কেবল একটি উপসংহারেই আসা যায় শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ঈমানী শক্তির লড়াই চিরন্তন। ব্রাদারহুডের মত মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী দল যখন ক্ষমতায় গিয়ে টিকে থাকতে পারেনি, তখন অদূর ভবিষ্যতে কোন ইসলামী দলের পক্ষে গণতন্ত্রের নামে বিজয় লাভের স্বপ্ন দেখা স্রেফ বাতুলতা। অতএব সময় এসেছে আত্মসমালোচনার, সময় এসেছে আত্মোপলব্ধির। পাশ্চাত্যের আপাত সুন্দর দুর্গন্ধময় গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে আর যাই হোক ইসলামের কোনই কল্যাণ আসতে পারে না, এ কথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। অতএব ইসলামকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হবে একমাত্র নবী-রাসূলদের দেখানো পদ্ধতিতে; কোন বাতিল পন্থায় ইসলাম যদি কখনো শাসন ক্ষমতায় আসেও তবুও তার অবস্থা 'ব্রাদারহুডে'র চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু হবে না, এ কথা চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়। সর্বোপরি এটাই সত্য যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোন মহৎ অর্জনও সাফল্য পেতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে আমাদেরকে হক্বকে চেনা এবং হক্বকে মানার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবেই আল্লাহর মদদ নেমে আসবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে যে অন্যায়-অত্যাচার ও মিথ্যা-প্রতারণার জোয়ার প্রবাহিত হচ্ছে তার গতিকে থামিয়ে দিয়ে সত্যের ঝাণ্ডা ওড়ানোর মত শক্তি-সামর্থ্য আমাদের দান করুন। আমীন!

ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন-এর ইসলাম গ্রহণ

গির্জা ছেড়ে মসজিদে

-কে.এম. রেজওয়ানুল ইসলাম

[সচেতন পাঠক একটু চিন্তা করলেই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, আমাদের চারপাশে এমন অনেক অতি সচেতন পিতা-মাতা আছেন যারা ২০-২২ বছর বয়সকে ছিয়াম পালন, ছালাত আদায়, হিজাব মেনে চলা তথা ইসলাম চর্চার জন্য উপযুক্ত মনে করেন না এবং তাদের নাবালক দুধের সন্তানদের (!) এসব ফরয ইবাদত পালন করা থেকে বিরত রাখেন। অথচ তারা জানেন না যে, বিশ্বের নানা প্রান্তে এমন কতক মানুষ আছেন যারা এই 'কচি বয়সেই' তাদের আপন কর্মগুণে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অত্র নিবন্ধে এমনই একজন মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমেরিকার বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ এই শিক্ষক ড. জোনাথন এ. সি. ব্রাউন বর্তমানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত অবদান রেখে চলেছেন। -নির্বাহী সম্পাদক]

জীবন ও কর্ম : ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন একজন আমেরিকান ইসলামী শিক্ষাবিদ, যিনি বর্তমানে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলাম শিক্ষা এবং মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক' বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। পিতা জোনাথন সি. ব্রাউন এবং মাতা নৃতত্ত্ববিদ এ্যালেন ক্লিফটন প্যাটারসন দম্পতির পরিবারে নবাগত সদস্য হিসাবে জোনাথন এ.সি. ব্রাউন ১৯৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের একুশতম বসন্তে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই তিনি ১৯৯৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও বাল্যকালে তিনি খ্রিষ্টীয় এ্যাংলিকান চার্চের অনুসারী হিসাবে লালিত-পালিত হন। ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোনাথন ব্রাউন ২০০০ সালে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'সেন্টার ফর এ্যারাবিক স্টাডি এবরোড'-এর অধীনে ১ বছর যাবৎ আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইসলামিক থট'-এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ড. ব্রাউন ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিয়াটলে অবস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচ্য ভাষা ও সভ্যতা' বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ২০১০ সাল থেকে অদ্যবধি তিনি জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলাম শিক্ষা এবং মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক' বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। অধিকন্তু তিনি আমেরিকার 'কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্স'-এরও একজন খণ্ডকালীন সদস্য।

ইসলামী সাহিত্যে অবদান : ড. ব্রাউন হাদীছ, ইসলামী আইন, সুফীবাদ, আরবী অভিধান, প্রাক ইসলামী কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্তমানে তিনি 'ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক সমালোচনা ও জালিয়াতির ইতিহাস' এবং 'ইসলামী চিন্তাধারায় পরবর্তী সুন্নীবাদ এবং সালাফীবাদের মধ্যে আধুনিক যুগের দ্বন্দ্ব' বিষয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার প্রয়োজনে তিনি মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, মরক্কো, সঊদী আরব, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

রচিত গ্রন্থসমূহ :

১. **'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়'** (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ ইং)।

২. **'হাদীছ : মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শের বাস্তবতা'** (২০০৯ইং)।

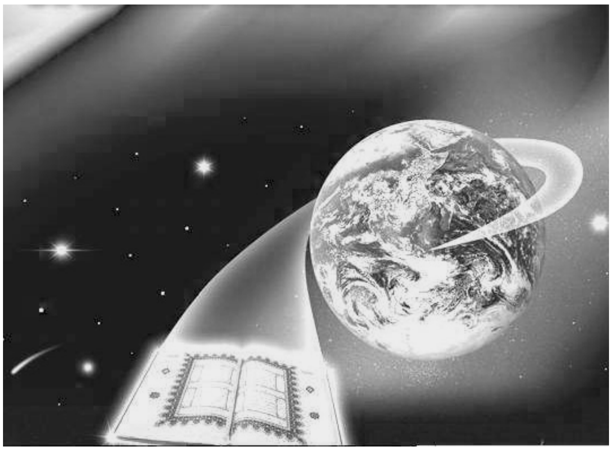
৩. **'বুখারী ও মুসলিম শরীফের সংকলন : সুন্নী হাদীছ সংকলন পদ্ধতি ও তার ব্যাবহারিক নীতিমালা'** (২০০৭ইং)।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরও কিছু বই এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ের উপর বিশ্বের কয়েকটি জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত জার্নালে ড. ব্রাউনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক জ্ঞানী মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

প্রশ্ন : আমরা কি আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি?

ড. ব্রাউন : একজন এ্যাংলিকান তথা আমেরিকায় অবস্থিত ইংলিশ চার্চ ভুক্ত খ্রিষ্টান হিসাবে আমি বড় হয়েছি। কিন্তু আমাদের পরিবার খুব একটা ধার্মিক ছিল না। তাই ঠিক খ্রিষ্টান হিসাবে আমি বেড়ে উঠিনি। যদিও আমি সবসময় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতাম। জর্জটাউন কলেজের ১ম বর্ষে পড়ার সময় আমি ইসলামের উপর একটি সাবজেক্ট নেই। ক্লাসটি নিতেন একজন মুসলিম শিক্ষিকা। তাঁর আলোচনা আমার কাছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লাগত। আমি অনুধাবন করলাম যে, সারা জীবন ধরে আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি সে বিষয়গুলিই তিনি আলোচনা করেন। যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি, বিচারবুদ্ধির ধারণা, যুক্তি এবং ধর্মের



সামঞ্জস্যতামূলক অবস্থানের ধারণা, ধর্মের উচিৎ মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করা, জীবনকে কঠিন করে তোলা বা ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়া নয় ইত্যাদি ধারণা। যখন সেমিস্টার সমাপ্ত হল তখন বাস্তবিকই আমি নিজেকে একজন মুসলিমের মত অনুভব করতে লাগলাম। সেই গ্রীষ্মে অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে ইসলামের উপর লিখিত প্রচুর বই পড়লাম এবং সারা ইউরোপ ও মরক্কো সফর করলাম। অতঃপর সফর

থেকে ফিরে কলেজে ঢোকার পরপরই ২য় বর্ষের শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে মুসলিম ঘোষণা করলাম।

প্রশ্ন : এর পূর্বে কোন মুসলিমের সাথে কি আপনার যোগাযোগ ছিল?

ড. ব্রাউন : না, আমার মনে পড়ে না। ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কোন মুসলিমের সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আপনার লেখা বইটার কথা আমরা সবাই জানি। সম্প্রতি জানলাম যে, আপনি নাকি নতুন আর একটা বই লিখছেন?

ড. ব্রাউন : হ্যাঁ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের একটি ধারাবাহিক প্রকাশনা কার্যক্রম আছে 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়' এই শিরোনামে। একই শিরোনামে তারা অনেক বিষয়ের উপর বই প্রকাশ করেছে। যেমন : 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'। এই ধারাবাহিক প্রকাশনার অংশ হিসাবে তারা আমার বইটা প্রকাশ করবে। বইটি আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরই লিখেছি। বইটি তারা এককভাবেও প্রকাশ করবে এবং এই সিরিজের একটি অংশ হিসাবেও প্রকাশ করবে। তবে একটু দেরী হচ্ছে কারণ প্রকাশের পূর্বে তারা আমার পাণ্ডুলিপি পাকিস্তানে পাঠিয়েছে এই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, বইতে মুসলিমদের জন্য অপমানজনক কিছু আছে কি না তা যাচাই করার জন্য। আমি তাদের বলতে চেয়েছিলাম, 'দেখুন আমি নিজে একজন মুসলিম। বইটির মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই মুসলমানদের রচিত। এতে মুসলিমদের জন্য অপমানজনক কিছু নেই'। বইটি লেখার পূর্বে বেশ কয়েকজন পশ্চিমা ঐতিহাসিকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম শুধু এটা জানতে যে, তারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কিভাবে মূল্যায়ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় আমি পেয়েছি সীরাহ এবং হাদীছ গ্রন্থসমূহে।

প্রশ্ন : আপনাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কোন বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে?

ড. ব্রাউন : সম্ভবত সকল পরিস্থিতিতেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমেরিকাতে ধর্মের মহাপুরুষদের আমরা শুধু একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরূপে পেয়ে থাকি। উদাহরণস্বরূপ যীশু সবসময় দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। কিন্তু আপনি তো সব সময় ক্ষমাশীল হতে পারেন না বা পারা উচিৎও না। কখনও হয়ত আপনাকে কোমল ও মধুর আচরণ করতে হবে, কখনও দ্বিধাহীন ও কঠোর হতে হবে, কখনও বা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে আবার হয়ত অন্য সময় আপনাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা নয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপনার আচরণ একাধারে শুধু একটি নীতিই অনুসরণ করে যাবে; বরং আপনাকে পরিস্থিতি বোঝার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সে মোতাবেক সর্বোত্তম উপায়ে কাজ করতে হবে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই কাজটিই খুব দক্ষতার সাথে করতে জানতেন এবং আমার মতে এটিই তার চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন : আজ মুসলিমরা কি তাঁর শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারছে?

ড. ব্রাউন : আমি মনে করি মুসলিমদের এই ব্যাপারটি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মহানবী (ছাঃ) কতটা আদর্শবাদী এবং সক্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে আদর্শ জীবন-যাপন করতেন এবং সাথে সাথে এটাও জানতেন কিভাবে নিজের আদর্শ প্রচার করতে হয় এবং কিভাবে কথার মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করতে হয়। তিনি আরও জানতেন কিভাবে কথা বললে মানুষকে নিজের অনুগামীতে পরিণত করা যায়। তিনি সবসময় খুব কঠোরতা বা খুব কড়া ও নির্মম নীতিপরায়ণতা দেখাতেন না। তিনি জানতেন আল্লাহর বাণী কিভাবে উপস্থাপন করলে তা প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুধাবনযোগ্য হতে পারে। তাই তিনি আল্লাহর একই বাণীকে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না ঘটিয়ে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতেন অর্থাৎ বিষয়বস্তু একই, তবে উপস্থাপনভঙ্গি আলাদা। এটা খুব কার্যকর পদ্ধতি। আমার মনে হয় মুসলিমরা যখনই নিজেকে ধার্মিক বলে ভাবতে শুরু করে তখন তারা কোন কোন বিষয় 'হারাম' তা ঘোষণা করতে মনোযোগী হয়। তবে সত্যিই যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হয়, তবে সবসময় আগে চিন্তা করা উচিৎ কোন কোন জিনিস 'হালাল' বা যথার্থ। দ্বীনকে অনুসরণের জন্য এটা সত্যিই খুব কার্যকর পদ্ধতি। একজন পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হতে গেলে এ নীতির বিকল্প নেই।

প্রশ্ন : ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছু ব্যক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এটা কেন?

ড. ব্রাউন : প্রথমতঃ অজ্ঞতা। সাধারণ মানুষ ইসলাম অথবা নবী (ছাঃ) সম্পর্কে আসলে কিছুই জানে না। তারা কেবল শুনে থাকে যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী এবং ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম। সুতরাং তাদের ধারণা মহানবী (ছাঃ)-কে অবশ্যই সন্ত্রাসের উৎস এবং এর প্রতীক হতে হবে। এটাই হল সবচেয়ে বড় কারণ। যা অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেন মুসলিম বিশ্বের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর এত সংঘাত? এর কারণ হল পশ্চিমা দেশগুলো অন্যায়ভাবে মুসলিম দেশগুলো আক্রমণ করছে এবং দখল করে রাখছে। যার জের ধরে তৈরী হচ্ছে রাজনৈতিক সমস্যা। আর একে কেন্দ্র করে পশ্চিমারা মুসলমানদের সন্ত্রাসীরূপে চিত্রিত করছে। কেননা মুসলিমরা তাদের যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এই সংঘাত নতুন নয়; এর এক লম্বা ইতিহাস রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে মহানবী (ছাঃ)-কে যে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা সহকারে চিত্রিত করা হচ্ছে, তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এটা একটা রাজনৈতিক সংঘাতের ফলশ্রুতি। আর সেই কারণে যদি রাস্তার কোন সাধারণ লোককে যদি 'ইসলাম' সম্পর্কে কিছু বলতে বলেন তবে দেখবেন তার মনে আসা শব্দগুলো হল সন্ত্রাসবাদ, নবী মুহাম্মাদ, চরমপন্থা, তলোয়ার, সহিংসতা ইত্যাদি। এই মিথ্যা কল্পনার পুনরাবৃত্তি চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

প্রশ্ন : মুসলিমদের এ ব্যাপারে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ড. ব্রাউন : মুসলিমদের উচিৎ হবে তাদেরকে সঠিক জ্ঞান দানের জন্য যথাসাধ্য পদক্ষেপ নেয়া। কেননা সাধারণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। বেশিরভাগ মানুষকে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী শোনানো হয় যে, মক্কায় কোন সংঘাত ছাড়াই কিভাবে তিনি ১৩ বছর কাটিয়ে দিলেন, যদিও মক্কার মুশরিকরা তার প্রতি অত্যাচার করেছিল, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। আমি মনে করি, প্রতিদিনই কাগজে লিখে হোক আর ইন্টারনেটে লিখে হোক মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

প্রশ্ন : ইউরোপে দিনের পর দিন ইসলামের ব্যাপারে প্রতিকূলতা এবং মিডিয়ার অপপ্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে কি অবস্থা?

ড. ব্রাউন : যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা খুব কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে সাংবিধানিকভাবেই ধর্মচর্চার অধিকার সুরক্ষিত। এখানে ক্লাস বা কাজ ছেড়ে দিয়ে খুব সহজেই ছালাত আদায় করতে যাওয়া যায়। এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। হিজাব পরার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন মহিলার সমালোচনা করে তবে তিনি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন অনায়াসেই। অবশ্য সন্ত্রাসবাদ নামক জুজুর ভয়ে অনেক সময় সরকার কোন কারণ ছাড়াই মুসলিমদের হয়রানি করে থাকে। এই ধারণা থেকে যে একজন প্রাক্টিসিং মুসলিম হল জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাদের ধারণা এ সকল মুসলিমরা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সাথে একমত নয়। অথচ মজার ব্যাপার হল, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার থেকে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সাথে একমত নন। কিন্তু একই অধিকার একজন মুসলিম চর্চা করলে তিনি হয়ে যান 'সম্ভাব্য চরমপন্থী' 'মৌলবাদী' (!)। ৯/১১-এর পর সেখানে একটা আইন পাশ করা হয় যা 'প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট' নামে পরিচিত। এই আইনের বলে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ঢালাওভাবে যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। বিনা অনুমতিতে ফোনকল রেকর্ড, যে কাউকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করার অধিকার দেয়া হয়েছে এ আইনে। আর কিউবার কুখ্যাত 'গুয়ানতানামো বে' কারাগারে মুসলিম নির্যাতনের বর্বরতা তো আজ বিশ্ব মানবতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি জানা গেছে যে, মুসলিম শিক্ষার্থীদের সকল তথ্য নাকি সি.আই.এ-র কাছে সংরক্ষিত থাকে?

ড. ব্রাউন : এই ধরনের ঘটনা প্রচুর ঘটছে যা আমেরিকার সর্বত্র সমালোচিত হচ্ছে। সরকার সংবিধান পরিপন্থী কাজ করছে এই অভিযোগে অনেক অমুসলিম আমেরিকানও এই নীতির বিরোধিতা করছে। সরকার কখনোই আপনার ফোনে আঁড়ি পাততে পারে না, যতক্ষণ আদালত অনুমতি না দেয়। ছাত্রদের উপর এত নজরদারিও করতে পারে না। এমনকি যদি কেউ লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন বই ইস্যু করে তবে সরকার সেটাও খতিয়ে দেখবে যে, সে কি ধরনের বই পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদের অন্য দেশেও পাঠাচ্ছে নির্যাতন করার জন্য। এটা একটা বিরাট বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমরা যেমন এই আইনের বিরোধী, তেমনি অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই এই অন্যায়ের ঘোর বিরোধী।

প্রশ্ন : মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি কি কখনো এমন বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন?

ড. ব্রাউন : না, এমন অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। তবে আমি যথার্থ উদাহরণ নই। কারণ আমার নাম জোনাথন ব্রাউন। আমার নামে বোঝা যায় না যে আমি কোন মুসলিম দেশের মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে আমার নাম বা চেহারার কারণে কোন ঝামেলার সম্মুখীন হইনি এখনও। একজন মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসাবেও কোন সমস্যা পোহাতে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সাধারণ জনগণ মুসলিমদের অভিব্যক্তি জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

প্রশ্ন : মুসলিম দেশ তুরস্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

ড. ব্রাউন : দেশটি আমার পছন্দের তালিকায় শীর্ষে আছে। আমি জানি এখানে মুসলিমরা খুব কঠিন অবস্থায় রয়েছে। তবুও আমি এদেশকে ভালবাসি। কারণ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যখনই খুশী মসজিদে ছালাত আদায় করা যায়। আর এখানকার খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। মাঝে মাঝে আক্ষেপ হয়, আহ! তুর্কী ভাষাটা যদি রপ্ত করতে পারতাম! আমি আসলে আরো অনেক কিছু জানতে চাই। তবে ইসলাম চর্চার জন্য তুরস্কের পরিবেশ খুব জটিল। তুর্কীদের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু এটা সত্যিই খুব জটিলতাপূর্ণ একটা দেশ।

প্রশ্ন : মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের এত অভাব কেন?

ড. ব্রাউন : সত্যিই, মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের আজ বড়ই অভাব। এর অন্যতম কারণ হল মানুষ কেবলই ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। ফলে আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারছি না। মুসলমানদের অনেকেই মনে করে যদি কারো সাথে কোন একটি বিষয়ে দ্বিমত হয় তবে তার সাথে আর কাজ করা যাবে না। কিন্তু এটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার। কেননা আপনি কখনোই সবার সাথে শতভাগ একমত হতে পারবেন না। তাই ভিন্নমতের চেয়ে সর্বদা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ খুঁজতে হবে। এটাই কল্যাণকর।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, এমন এক বা দুইটি রাজনৈতিক শক্তি থাকা দরকার যারা মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবে? যেমন ধরুন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি ওআইসির অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে?

ড. ব্রাউন : এটা একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলোতে যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পর সমঝোতায় আসতে পারে তবে অচিরেই তারা সংঘবদ্ধভাবে অন্যান্য দেশগুলোর সাথে দর কষাকষি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। ধরুন ফ্রান্সের মত কোন দেশ যদি মুসলিম নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে, তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একযোগে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে এবং প্রয়োজনে সে দেশকে বর্জন করতে হবে। কেননা কেউ যদি তার ধর্মীয় পোশাক পরিধান করতে চায় তবে এটা তার একান্ত মৌলিক অধিকার। আমি নিশ্চিত যে, আমার মত কোন মার্কিন নাগরিকই স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চায় বাধা প্রদানে একমত হবেন না। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হল মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে রাজনৈতিক প্রভাব রাখার মত শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করতে চাইবে তখন কোন মুসলিম দেশই তা সমর্থন করবে না এবং আক্রমণকারীদেরকে নিজস্ব আকাশসীমা এবং স্থলভাগ ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

যাইহোক মুসলমানদের এই ঐক্যজোট স্বয়ং আমেরিকার জন্যও মঙ্গল বয়ে আনত। কেননা বেশিরভাগ আমেরিকান এখন বুঝতে পেরেছে যে, ইরাক আক্রমণ ছিল ইতিহাসের একটি অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত। তাদের মতে, যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সহযোগিতা ও সমর্থন না করে একজোট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এ আগ্রাসন চালাতে বাধা প্রদান করত তবে হয়ত লাখ লাখ ডলার আর নিরীহ মানুষের জীবনের অপচয় রোধ করা সম্ভব হত।

প্রশ্ন : পরিশেষে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে আপনি কি কোন উপদেশ দিবেন?

ড. ব্রাউন : কেউ যদি তোমাকে নসীহত প্রদান করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় তবে সেটা হবে তোমার জন্য পার্থিব জীবনের সেরা উপহার। আল্লাহু আকবার!

তথ্যসূত্র : ওয়েবসাইট

[লেখক : ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ক্যাম্পাস]

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)

-মুহাম্মাদ তামীমুল ইসলাম

ভূমিকা :

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ছিলেন মুসলিম ইতিহাসে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান সেনাপতি। যিনি রণক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও মেধার দ্বারা বাতিলের শক্তি মূলোৎপাটন করে তাওহীদের ঝান্ডাকে বুলন্দ করেছিলেন। মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ 'আবকারিয়াতু খালিদ' নামক গ্রন্থে তাঁর সামরিক ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে বলেন, 'সামরিক নেতৃত্বের সব গুণাবলীই খালিদ (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল। বাহাদুরী, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন, অত্যধিক ক্ষিপ্রতা এবং শত্রুর উপর অকল্পনীয় আঘাত হানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় *(তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদ : আব্দুল কাদের (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ; ১৯৯৪ খ্রিঃ, ১/১৮৮ পৃঃ)।* নিম্নে এ কুশাগ্রবুদ্ধি মহান সেনাপতির সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হ'ল।

নাম ও জন্ম :

মূল নাম খালিদ, উপনাম আবু সুলায়মান ও আবুল ওয়ালীদ। লক্বব সাইফুল্লাহ (আল্লাহ্র তরবারী)। মূতার যুদ্ধে অসমান্য অবদানের জন্য তিনি 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

খালিদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, নবুয়তের ১৫ অথবা ১৬ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় তাঁর ২৪ অথবা ২৫ বছর বয়স হয়েছিল।

বংশ পরিচয় :

পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা। মাতা লুবাবা আস-সুগরা। যিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত ময়মুনা বিনতুল হারিছের বোন *(আছহাবে রাসূল ২/৬৩ পৃঃ)।* এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খালু। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে-খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম আল-কুরাশী আল-মাখযুমী *(আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা, ২/৯৮ পৃঃ)।*

ইসলাম গ্রহণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালিদ ইবনু ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের জন্য দো'আ করতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, সালামা ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন'। এ দো'আর বরকতে আল্লাহ্র রহমতে ৭ম হিজরী সনে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেন *(তাফসীর ইবনু কাছীর ১৬৩ পৃঃ)।* তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আসমাউর রিজালের বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি ৮ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা সবার জানা কথা। এটা অষ্টম হিজরীর ঘটনা। অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়, আমর হাবশা থেকে ফেরার পথে খালিদ এবং উছমান ইবন ত্বালহার সাথে সাক্ষাত হয় এবং তারা তিনজন একত্রে ইসলামের গ্রহণ করে। এতে বোঝা যায় এরা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকই সবকিছু ভাল জানেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম ৩৫৭ পৃঃ)।* হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালিদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকালে বলেছিলাম আল্লাহ্র পথে বাঁধা সৃষ্টি করে জীবনে যত পাপ করেছি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তা ক্ষমার জন্য দো'আ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'ইসলাম অতীতের সকল গুনাহসমূহকে মুছে দেয়'। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি এ কথার উপর বায়'আত করলাম *(রিজালুন হাওলার রাসূল, ২৮৪ পৃঃ)।*

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে খালিদ :

হিজরী নবম সনে রাসূল (ছাঃ) খালিদকে তাওহীদের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে বনী জুজাইম গোত্রে প্রেরণ করেন। খালিদের দাওয়াতের ফলে বনী জুজাইম গোত্র ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ তারা তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে না পারায় খালিদ তাদের ভুল বোঝেন। তিনি তাদেরকে হত্যার আদেশ দেন। ফলে সে গোত্রের বহুলোককে হত্যা করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি অবহত হ'লে তিনি ভীষণ দুঃখিত হন। তিনি হাত উঠিয়ে দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ খালিদ যা করেছে এ ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠান এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। এমনকি তাদের নিহত প্রাণীগুলোরও ক্ষতিপূরণ দেন *(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, পৃঃ ৪৫০)।*

১০ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালিদ (রাঃ)-কে নাজরানের বনু আব্দিল মাদ্দাদের গোত্রে পাঠান। যেহেতু খালিদ বনু জুজাইমের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কঠিন ভুল করেছিলেন সেজন্য রাসূল (ছাঃ) এ যাত্রার পূর্বে তাকে বিশেষভাবে নছীহত করে বলেন, 'কেবল ইসলামের দাওয়াতই দিবে, কোন অবস্থাতেই তলোয়ার উঠাবে না। তিনি এ নছীহত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেন। তার দাওয়াতে মাদ্দান গোত্র ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়। এ সকল নওমুসলিমদের তিনি দ্বীনী তা'লীম ও তারবিয়াত শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে নিয়ে আসেন। একই বছরে ইয়ামানবাসীর নিকটে দাওয়াত প্রচারে খালিদ ও আলী (রাঃ)-কে পাঠান। তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইয়ামানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে *(আসহাবে রাসূল, ২/৬৬ পৃঃ)।*

মূর্তি ভাঙ্গলেন খালিদ :

জাহেলী যুগে আরববাসীদের মূর্তিপূজার একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল উজ্জা। রাসূল (ছাঃ) খালিদকে ঐ কেন্দ্রীয় মূর্তিটি ধ্বংসের জন্য পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে নিম্নের পংক্তিটি আবৃতি করতে করতে তাকে মাটির সাথে গুড়িয়ে দেন, 'ওহে উজ্জা তুই অপবিত্র, আমরা তোকে অস্বীকার করি। আমি দেখেছি আল্লাহ তোকে অপমান করেছেন'।

সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহ্র তরবারী উপাধি লাভ :

মূতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতিকে হারিয়ে মুসলিম বাহিনী যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন তারা খালিদ ইবন ওয়ালীদকে সিপাহসালার মনোনীত করেন। অতঃপর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে খালিদ অসীম বীরত্ব ও অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর এই তেজস্বীতা ও বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহ্র তরবারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

রণাঙ্গনে খালিদ :

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের মাত্র দুমাস পরেই সর্বপ্রথম মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ

মূতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যায়েদ ইবনু হারিছা (রাঃ)-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নির্দেশ দেন যায়েদ নিহত হ'লে জাফর আর জাফর নিহত হ'লে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। যখন উভয়পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হ'ল তখন তিন সেনা কমান্ডারই অতুলনীয় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর জনতার মতামতের ভিত্তিতে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) সেনা কমান্ডার নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি অসীম বীরত্ব দেখিয়ে শত্রু পক্ষকে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে দেন। তিন তিনজন সুযোগ্য সেনা নায়ককে হারিয়েও মুসলমানরা অবশেষে বিজয় লাভ করেছিল *(আর-রাহীকুল মাখতুম ৪০১-৪০২ পৃঃ)*। ছহীহ বুখারীতে স্বয়ং খালিদ ইবনু ওয়ালিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। এরপর আমার একটি ইয়ামানী তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল *(ছহীহ বুখারী, মূতার যুদ্ধ অধ্যায় ২/৭১১ পৃঃ)*।

১০ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের মূহূর্তে ছাহাবাগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন রাসূল (ছাঃ) খালিদকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন মক্কার ঢালু এলাকায় প্রবেশ করেন। নবী (ছাঃ) খালিদকে বলেন, যদি কুরাইশরা কেউ তোমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাহ'লে তুমি তাকে ক্বতল করবে। এরপর মক্কায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে। খালিদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের পথে যেসব পৌত্তলিক বাঁধা হয়ে এসেছিল তাদেরকে মুকাবেলা করে হত্যা করেন। অতঃপর খান্দামা নামক স্থানে খালিদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে উচ্ছৃঙ্খল কতিপয় কুরাইশ পক্ষ মুখোমুখি হয়। কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলে। এতে বারো জন কুরাইশ নিহত হয়। এ ঘটনায় কুরাইশদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হাম্মাম ভয়ে ভীতু হয়ে ছুটে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। এভাবে খালিদ (রাঃ) মক্কার দক্ষিণাংশের সমস্ত বিপর্যয় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মিলিত হন *(আর-রাহীকুল মাখতুম ৪১৯ পৃঃ)*।

ভণ্ডনবীদের দমনে খালিদ :

রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সমস্ত আরবে বিদ্রোহের দানা বাঁধতে থাকে। একদিকে ইসলাম ত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারী, অপর দিকে ভণ্ডনবীদের উৎপাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই ফেৎনাবাজদের শিরদাড়া গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে আবু বকর (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবীদের অনুরোধে তিনি তা করেননি বরং মদীনাতেই রয়ে গেলেন। তিনি গোটা সেনাবাহিনীকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১টি ভাগের দায়িত্ব দিলেন খালিদকে। খালিদকে মদীনা থেকে বিদায় দেওয়ার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমার সম্পর্কে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'খালিদ আল্লাহর একটি তরবারী–যা আল্লাহ কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। খালিদ আল্লাহর কতইনা ভাল বান্দা' *(রিজালুন হাওলার রাসূল ২৯৩ পৃঃ)*। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভণ্ডনবী তুলায়হার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তুমুল যুদ্ধ চলছে। প্রতিটি সংঘর্ষে তুলায়হা পরাজয় বরণ করছে। এমন সময় তুলায়হা একদিন তার আপনজনদের জিজ্ঞাসা করল আমাদের এত বিপুল সৈন্য থাকতেও আমাদের এমন শোচনীয় পরাজয় কেন? তার সঙ্গীরা তাকে বলল, আমাদের প্রত্যেকেই চায় তাঁর সাথী আগে মারা যাক আর তারা প্রত্যেকেই চায় যে সে তাঁর সঙ্গীর আগে মৃত্যুবরণ করুক *(হায়াতুছ ছাহাবা ৩/৬৯৩ পৃঃ)*। অতঃপর খালিদ তুলায়হার সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করেন এবং ৩০ জনকে বন্দী করেন।

তারপর তিনি মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মুসায়লামা হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়ে চির বিদায় নেয় *(আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ২/৬৭ পৃঃ)*। 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থকার বলেন, ভণ্ড নবীদের ফিৎনা নির্মূল করার পর হযরত খালিদ (রাঃ) যাকাতদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মুরতাদদের দিকে ধাবিত হন এবং তাদের উপর কঠিনতর আঘাত হানেন। তাদের কিছু মারা যায় এবং কিছু ধৃত হয়। আর অবশিষ্টরা তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে' *(তারীখুল খুলাফা, ৭২ পৃঃ)*।

অপরাজিত এক বীর সিপাহসালার খালিদ :

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের পর খালিদ ইরাক অভিমুখে রওয়ানা দেন। আনবার, আইনুত তামুর, দুমা, হীরা ও সোনা প্রভৃতি অঞ্চল অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিজয় লাভ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) সর্বশেষ যুদ্ধ করেন ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে। ফোরাতের এক তীরে মুসলিম বাহিনী অপর তীরে ইরাকী বাহিনী। ইরাকীদের প্রস্তাবমতে তাদেরকে নদী পার হবার সুযোগ দিলে তারা নদী পার হয়। মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীকে তিন দিক ঘিরে ফেলে। তাদের পিছনে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা বিশাল নদী। সামনে মুসলিম সৈন্যদের তরবারীর ভেদ। পিছনে সুবিশাল সমুদ্র। পালানোর কোন পথ নেই। সামনে অতিক্রম করলে তরবারীর আঘাত আর পিছনে ফিরে গেলে ডুবে মরা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। অতঃপর মুসলিম বাহিনী শত্রু পক্ষকে কঠিনভাবে আক্রমণ করে। ফলে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। পরিশেষে যুদ্ধ বিজয়ের পর খালিদ গোপনে হজ্জ করতে যান *(আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৬৮ পৃঃ)*।

ইরাক জয়ের পরপরই খালিদ (রাঃ) খলীফার নির্দেশে বসরায় যান ও পূর্বে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করেন। খালিদ সেখানে পৌঁছেই বসরায় আক্রমণ করেন। তার আক্রমণে হতভম্ব হয়ে বসরাবাসী ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাদের শান্তি চুক্তি করে। এরপর খালিদ সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। সিরিয়ায় অভিযানের প্রথমেই খালিদ দামেশক অবরোধ করেন। সেখানে খালিদ (রাঃ) প্রায় ছয়মাস অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারেন নি। এ সময় এক পাদ্রীর পুত্র সন্তান জন্মের কারণে আনন্দে নগরীর অধিবাসীরা মদপানে মত্ত ছিল। তাই সময় বুঝে একদিন রাতে খালিদ তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেন ও দ্বাররক্ষীদের হত্যা করেন। ফলে নগরের প্রধান ফটক মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত হয়। অকস্মাৎ আক্রমণে ভীত হয়ে তারা তরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। এ অভিযানে আবু ওবায়দা, আমর ইবনুল 'আছ ও সুরাহবিল (রাঃ) খালিদকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

দামেশক বিজয়ের পর খালিদ (রাঃ) জর্দান অভিমুখে রওয়ানা দেন এবং জর্দানের নিকটবর্তী ফিহল নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। রোমানরা সেখানে অযৌক্তিক প্রস্তাব সম্বলিত সন্ধি প্রস্তাব দেয়। মুসলমানরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে রোমানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দামেশক জর্দান ও হিমসের ন্যায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের পতনে রোমান সম্রাট ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ২,৪০,০০০ জনের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান বিভিন্ন কমান্ডার পৃথকভাবে সৈন্য পরিচালনা করছেন। তখন খালিদ (রাঃ) যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এক গুরুগম্ভীর ভাষণ প্রদান করেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বলেন, 'আজকে এ দিন আল্লাহর নিকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। তোমরা গর্ব অহংকার থেকে বিরত থাক।

তোমরা খালেছভাবে যুদ্ধ কর। তোমাদের কাজের জন্য প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা কর। এসো আমরা নেতৃত্ব ভাগাভাগি করি। কেউ আজ কেউ আগামী ও কেউ পরশু আমীর হই। আর আজকের দিন আমার উপর ছেড়ে দাও'। অতঃপর তাঁর এই তেজোদীপ্ত বক্তব্য সকলে সমর্থন দিল। প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে খালিদ (রাঃ) মুসলিম সেনাদলকে এমনভাবে বিন্যস্ত করলেন যে আরবরা কোনদিন এমন বিন্যস্তকরণ চোখে দেখেনি *(আছহাবে রাসূলদের জীবনকথা ২/৬৯)*। অতঃপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। রোমানরা এমনভাবে আক্রমণ করল যে আরবরা এরকম বিপদে ইতিপূর্বে কখনও নিমজ্জিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর মাঝখানের দায়িত্বে ছিলেন কাকা ও ইকরামা (রাঃ)। খালিদ তাদেরকে ও সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ফলে যুদ্ধ সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করল। হযরত খালিদও তীব্র আক্রমণ চালালেন। তিনি যে দিক গেলেন সে দিকের রোমান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের শোচনীয় পরাজয় হল। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, এ যুদ্ধে লক্ষাধিক রোমান সৈন্য নিহত হয়।

এরপর মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। এ অবরোধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধানদের মধ্যে খালিদও ছিলেন একজন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীরা বাঁচার কোন পথ না পেয়ে স্বয়ং উমার (রাঃ)-এর নিকট সন্ধিচুক্তি করার প্রস্তাব দেন। তাদের অনুরোধে উমার (রাঃ) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এভাবেই প্রত্যেক যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সুতীক্ষ্ম ও সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদান করে ইসলামের বিজয় পতাকা বিশ্বের ময়দানে উড্ডীন করেন।

প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ ঃ

খলীফা উমার (রাঃ) খালিদ (রাঃ)-কে ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন। অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) সর্বত্র ঘোষণা দেন যে, 'আমি খালিদকে আস্থাহীনতা, ক্রোধবশতঃ বা এ জাতীয় কোন কারণে অপসরণ করিনি। শুধুমাত্র এ কারণে পদচ্যুত করেছি যে, মুসলমানরা জেনে নিক যে, খালিদের শক্তির ওপর ইসলামের বিজয়সমূহ নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামের বিজয় আল্লাহ্‌র মদদ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল *(ইবনুল আছীর, তারিখে কামিল, ২/৪১৮ পৃঃ)*।

অপসারণের কারণ ঃ

তার অপসারেণের করণ সম্পর্কে ইতিহাসে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। **প্রথমত,** মুসলিম অমুসলিম সকলেই ধারণা করত যে, খালিদ বিন ওয়ালিদের কারণে প্রত্যেক যুদ্ধে বিজয় হচ্ছে। খলিফা এ কুধারণা দূর করার জন্য তাকে অব্যাহতি দেন *(আছহাবে রাসূল ২/৭৩ পৃঃ)*।

দ্বিতীয়ত, তাঁর অব্যাহতির ঘটনা কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ (রাঃ)-এর ব্যয় কখনো কখনো সীমা অতিক্রম করত। মাঝে মাঝে তিনি বিপুল পরিমাণে সম্পদ দান করতেন। তিনি কবি আশ'আছ ইবনে ক্বায়েসকে ১০ হাজার দিরহাম দান করে দেন। খলিফা বিষয়টি অবগত হয়ে আবূ উবায়দাকে জিজ্ঞেস করতে বলেন, তিনি কোন খাত থেকে এ অর্থ ব্যয় করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন নিজের অর্থ থেকে। তারপর তিনি খলীফার নির্দেশ পড়ে শোনান। অতঃপর খালিদ (রাঃ) বলেন, আমি খলীফার ফরমান শুনলাম ও মানলাম। কারো মতে এ ঘটনা ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে ঘটে *(আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ২/৭২ পৃঃ)*।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :

খলীফার উক্ত অব্যাহতি আদেশ তিনি অবনত মস্তকে মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিক বেশে বাকি যুদ্ধে শরীক থাকেন। তারপর খলীফা তাকে সিরিয়ার রাহা, হিরাত, আমদ এবং লারতার অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন *(আছহাবে রাসূলের জীবনকথা, ২/৭২ পৃঃ)*। অতঃপর তিনি খলীফা প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে দ্রুত সিরিয়ায় গমন করেন। তিনি ইয়াযীদকে লেবানন, আমর (রাঃ)-কে জেরুজালেম, সুরাহবিলকে জর্দান অভিমুখে পেরণ করেন এবং তিনি দ্রুত গতিতে বলবেক, এডেসা, আলেপ্পো, কিন্নিসিরিন প্রভৃতি স্থান দখন করে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর এভাবে তিনি একজন সুদক্ষ সেনানায়ক থেকে একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রীয় শাসকে পরিণত হন।

সেখানে কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ অল্প সময়েই তিনি মোট ১২৫ মতান্তরে ৩০০ টি ছোট-বড় যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তবে মজার বিষয় হল তিনি কোন যুদ্ধেই পরাজিত হননি *(ইবনুল আছীর, তারীখে কামিল, ৪১৮ পৃঃ)*।

ইলমে হাদীছে তাঁর অবদান ঃ

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে প্রায় মৃত্যু অবধি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করেছেন। মহানবী (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকার খুবই কম সুযোগ পেয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, জিহাদের ব্যস্ততা আমাকে কুরআনের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে *(আল-ইছাবা, ৪১৫ পৃঃ)*। তারপরেও তিনি এ শিক্ষা থেকে একেবারে বঞ্চিত থেকেছেন তা নয়। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যতটুকু সময় কাঁটাতে পেরেছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি মোট ১৮ মতান্তরে ১৭টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ হাদীছ ২টি এবং বুখারী এককভাবে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ফৎওয়া বিভাগে সাধারণত বসতেন না। তাই তার ফৎওয়ার সংখ্যা দুটির বেশি পাওয়া যায় না।

ইন্তেকাল ঃ

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ৬৩৯ খ্রিঃ মোতাবেক হিজরী ২১ মতান্তরে ২২ সালে কিছুদিন অসুস্থ হন এবং ৬০ বছর বয়সে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি 'হিমছ'-এ মৃত্যুবরণ করেন। তবে এ মত ঠিক নয় বলে ধারণা করা হয়। কারণ খলীফা উমর (রাঃ) তাঁর যানাযায় উপস্থিত হন বলে ধারণা করা হয় *(উসদুল গাবা ১/৯৫)*। খালিদের মৃত্যুতে উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেছিলেন, 'নারীরা খালিদের মত সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।' এমন কি তাঁর মৃত্যুতে খলীফা নিজে কেঁদেছিলেন *(রিজালুন হাওলার রাসূল, ৩০৫ পৃঃ)*।

উপসংহার ঃ

খালিদ (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের আসনে সমাসীন। সামরিক ক্ষেত্রে এবং রণাঙ্গনে তাঁর যে অবদান তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পাশাপাশি এ কথাও স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, তিনি একজন যোগ্য শাসকও ছিলেন। পরিশেষে 'খালিদ সাইফুল্লাহ' নামক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি। সেখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ তা'আলা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর উপর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ভুলবার নয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ, আমরা যেন তার জীবনীর বিভিন্ন ঘটনাবলীকে নিয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কারণ মুসলিম জাতির তাঁর গুণাবলী অবলম্বনের মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা নিহিত'। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

[লেখক : সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মারকায এলাকা]

ফিলিস্তীনে ইহুদীবাদের জন্ম ও তাদের দাবীর যথার্থতা

-মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী

বিশ্ব মানচিত্রে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের অবস্থান মুসলিম বিশ্বের নিকটে এক জাতিগত প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। কেননা সেখানে অসংখ্য নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে। বিশেষ করে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আগমন ফিলিস্তীনের প্রতি সমগ্র মুসলিম জাতির এক বিরাট হৃদ্যতার কারণ। কিন্তু খ্রিষ্টান ও ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বকে বিমূঢ় ও হতবাক করে ১৯১৮ সালে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডের একাংশকে ইহুদীদের 'স্বাধীন আবাসভূমি' হিসাবে ঘোষণা করে। শুরু হয় মুসলিমদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার। ঘোষিত হয় ফিলিস্তীনে মুসলমান উজাড়ের পরিকল্পনা। অবশেষে জোটবদ্ধ হয় পাশ্চাত্যের সকল দেশ ও জাতি। নিম্নে ফিলিস্তীনে ইহুদীবাদের জন্ম ও তাদের দাবীর যথার্থতা কতটুকু তা বিশ্লেষণ করা হ'ল।

ইহুদীবাদের পরিচয়:

ইহুদী সম্প্রদায় বিভিন্ন খেতাবে পরিচিত। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তাদেরকে বনী ইসরাঈল, আহলে কিতাব ও ইহুদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন- 'হে বনী ইসরাঈলের বংশধর! তোমরা আমার প্রদত্ত নিয়ামত সমুহের কথা স্মরণ কর। যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি' *(বাক্বারাহ ২/৪০)*। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর একটি খেতাব ছিল ইসরাঈল। হিব্রু ভাষায় যার অর্থ আল্লাহ্র বান্দা *(নবীদের কাহিনী ২/১২)*। আর তারা যে ইহুদী পরিচয় দিয়ে থাকে, সেই ইয়াহুদ ছিল হযরত ইয়াকুব (আ:)-এর ৪র্থ পুত্র। ইংরেজীতে এ জাতি জু (JEW) নামে এবং তাদের ধর্ম জুডাইজম (Judaism) নামে পরিচিত। যাকে তারা 'জুডিস' নামক এক স্থানের নামানুসারে নামকরণ করেন। বর্তমানে তারা জায়োনিস্ট (Zionist) নামেও পরিচিত। যা জেরুজালেমে অবস্থিত 'জায়োন' (Zion) নামক এক পাহাড়ের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। ১৮৮০ সালে নাকান বেরেনবুয়ান নামে এক অস্ট্রিয়ান ইহুদী তাদের তথাকথিত পবিত্র ভূমি জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি আন্দোলনের প্রস্তাব করেন এবং উক্ত নামে আন্দোলন গড়ে তোলেন। অতঃপর ১৮৯৬ সালে অস্ট্রিয়ান এক দুর্ধর্ষ ইহুদী সাংবাদিক ডঃ থিওডর হার্জেল (১৮৬০-১৯০৪) তার রচিত The Jewish State গ্রন্থটির মাধ্যমে জায়োনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং International Zionist Organization নামে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন *(দৈনিক সংগ্রাম, ০১/০১/২০০১ইং)*। আবার এই ইহুদী সাংবাদিকের নেতৃত্বেই ১৮৯৭ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্টে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এই ইহুদীবাদের শক্ত ভিত্তি তৈরী হয় সুইজারল্যাণ্ডের বাযিল (BAZIL) নগরীতে। অতঃপর বিশ্বের ৩০টি ইহুদী সংগঠনের প্রায় ৩০০ জন ইহুদী নেতা ইহুদীবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পিত নীল-নকশা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে যে পরিকল্পনাটি ২৪ প্রটোকল আকারে প্রণীত হয়। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে জনৈকা খ্রিষ্টান মহিলা সেই প্রটোকলের এক কপি চুরি করে দুনিয়ার সম্মুখে প্রকাশ করে দেন (*তথ্য সন্ত্রাস-জহুরী; উত্তরণ প্রকাশনী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৯৯ইং, পৃঃ ১২১*)। আবার বৃটেনে সংঘটিত হয় ২ বছরব্যাপী (১৯০৫-১৯০৭) এক কনফারেন্স। সেখানে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল- মুসলিম বিশ্বকে চিরস্থায়ী পঙ্গু করার জন্য সুয়েজ খাল ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে মুসলিম বিশ্বের অন্তঃস্থলে এমন এক জাতিকে পুনর্বাসিত করা, যারা হবে মুসলমানদের চির শত্রু এবং তাদের ভূ-গর্ভস্থ স্বর্ণ, তৈল সম্পদ লুণ্ঠন ও মিডিয়াকে নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করবে। আর এই কনফারেন্সের সুপারিশক্রমে বৃটেন বিশ্বের সকল মুসলমানদের চিরস্থায়ীভাবে পরাস্ত ও পঙ্গু করার এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বালফোর (Lord Balfour) ইহুদীবাদ আন্দোলনের নেতা লর্ড রোথসচাইল্ডকে একটি চিঠি লিখেন। যা 'দ্য বালফোর ডিক্লারেশন' (The Balfour Declaration) নামে খ্যাত। চিঠিতে বলা হয়, 'Britain would use its best endeavors facilitate the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people'. অর্থাৎ 'ফিলিস্তীনে ইহুদী জাতির জন্য একটি জাতীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৃটেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে'।

১৯১৭ সালের ০২ নভেম্বর The Balfour Declaration সম্পন্ন হয় এবং একই বছরের ডিসেম্বরে বৃটিশরা ফিলিস্তীনের অর্ধাংশ দখল করে। অতঃপর ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তারা পুরো ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। আর জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী সে সময়ে ফিলিস্তীনের মোট ৭ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৫ লাখ ৭৪ হাজার ছিল মুসলমান, ৭৪ হাজার খ্রিষ্টান এবং ৫৬ হাজার ইহুদী। এছাড়া সেময়ে ৫০ হাজার ইহুদী রাশিয়া, জার্মান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইয়েমেন, ভারত ও চীন থেকে আগমন করে ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত হয়। এভাবে ৩১ বছর পর ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনে আগন্তুক ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখ ৫০ হাজার। যার মধ্যে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্য ছিল ৭০ হাজার। অতঃপর ১৯৬৭ সালে তারা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' দখল করার সাথে সাথে গাজা, জেরিকো, গোলান মালভূমি, সিনাই উপত্যকাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নেয় *(দৈনিক সংগ্রাম, ০১/০১/২০০১ইং)*। আর এমনিভাবেই শুরু হ'ল ফিলিস্তীনে জায়োনিস্ট বা ইহুদীদের উপনিবেশ বা বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের যাত্রা। অন্যদিকে সূচনা হয় ফিলিস্তীনী মুসলমানদের লাশের মর্মন্তুদ মিছিল। যার ধারাবাহিকতায় অদ্যবধি সারা বিশ্বে একযোগে চলছে ইহুদী-খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত মুসলমান নিধনের নিয়মিত হোলিখেলা।

ফিলিস্তীনের আদিবাসীদের পরিচয় :

মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায় উভয়ের দাবী হ'ল, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের জাতির পিতা এবং ফিলিস্তীন তাদের আদি বাসভূমি। আর মুসলমানদের এ দাবীর স্বপক্ষে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 'তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল (ছাঃ) তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও সমস্ত মানব জাতির জন্য' *(হজ্জ ২২/৭৮)*। মূলতঃ মুসলমানরা হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর প্রকৃত বংশধর। আর ইহুদীরা দাবী করে তারা হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর বংশধর। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যমতে, অধিকাংশ ইহুদীরাই কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস এলাকায় বসবাস করত। প্রায় ২০০০ বছর ধরে সম্পূর্ণ ফিলিস্তীন এলাকা ইহুদী শূন্য ছিল। তাছাড়া তাদের ধর্মীয় দাবীর পাশাপাশি ঐতিহাসিক দাবী হ'ল, তারা কোন

এক সময় প্রায় চারশত বছর ধরে এ এলাকা শাসন করেছে, কাজেই এটা তাদের ভূখণ্ড। অথচ তৎপরবর্তীতে মুসলমানরা ১৩৫০ বছর যাবৎ ফিলিস্তীন শাসন করেছে। সুতরাং তাদের এই হাস্যকর দাবী আমলে নিলেও তাদের চেয়ে এখানে মুসলমানদের অধিকার বেশী। কেননা মুসলমানরা এখানে ইহুদীদের চেয়ে তিনগুন বেশী সময় ধরে শাসন করেছে। অতএব এটা মুসলমানদের প্রকৃত ভূখণ্ড।

ফিলিস্তীনীদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ক্রমধারা :

আধুনিক সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় মূলতঃ আনুমানিক ৩০০০ বছর পূর্বে ব্যাবিলনে এবং ২৮০০ বছর পূর্বে ফিলিস্তীনে। কেননা জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন হিজরত করে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ফিলিস্তীনে আসেন তখনও তিনি সেখানে জনবসতি ও সভ্যতার উৎকর্ষতা লক্ষ্য করেন *(দৈনিক সংগ্রাম, ০১/০১/২০০১ইং)*। কারণ হযরত নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হলেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। মহাপ্লাবনের পর তার সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে নতুন করে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণেই তাকে أبو البشر الثاني বা 'মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা' বলা হয় *(নবীদের কাহিনী ১/৫৩ পৃঃ)*। আর তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম রাসূল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২)*। পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি একই ভূখণ্ডে বসবাস করত এবং পরবর্তী কালে তাদের চাহিদামত পৃথিবীর বিভিন্ন চারণভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৬ পৃঃ)*। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ 'আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি' *(ছাফফাত-৩৭/৭৭)*। অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর কেবল তার তিন পুত্রসহ মুমিন নর-নারীগণই অবশিষ্ট ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, সবচেয়ে পূরাতন জাতি হল সেমেটিক জাতি। সেমেটিক শব্দটি আদি বাইবেল (Old testment)-এ সেম (Shem) হতে উদ্ভূত বলে উল্লেখিত হয়েছে *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ৫১ পৃঃ)*। হযরত নূহ (আঃ)-এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র সাম (سام)-এর বংশধর সেমেটিক জাতি নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ابو العرب বা আরব জাতির পিতা। আর তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক (আঃ)-দের মত বিশ্ববিশ্রুত মহান ব্যক্তিদের আবির্ভাব। আর ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(নবীদের কাহিনী ১/৫২ পৃঃ)*। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'সেমিটিক জাতির আদি বাসস্থান মেসোপটেমিয়া। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮০০ সালে ব্যাবিলন সভ্যতার বিকাশ লাভ করে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হতে ৫০০ সালের মধ্যে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মেসোপটেমিয়া থেকে ফোরাত-দজলা উপত্যকা, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, সিনাই এলাকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে' *(ইসলামের ইতিহাস, ৩-৫)*। খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ হতে ২৫০০ সালের মাঝে বনু কেনান ফিলিস্তীনে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। আর এটা ঘটেছিল বনী ইসরাঈলদের আসার ১৫০০ বছর পূর্বে *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃ: ২০-২২।)* আবার আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪৬ থেকে ১৪২৩ সালের মধ্যবর্তী সময় হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪২৩ সালে ফেরাউন ও তার দলবল সকলেরই সাগরে ডুবে সলিল সমাধি হয়। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৬ সাল পর্যন্ত রাসূল হিসেবে বনী ইসরাঈলদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তীহ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী অবস্থায় থাকা কালে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৬ সালে মারা যান *(নবীদের কাহিনী ২/১৪-১৫পৃঃ)*। খ্রীষ্টপূর্ব ১০৯১ সালে শ্যামূয়েল (شمويل) নবী তালূতকে তাদের বাদশা বানিয়ে দেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০৯১-১০৭৫ সালে তালুত *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৬৬)*, খ্রীষ্টপূর্ব ১০৭৫-১০১৫ সালে হযরত দাউদ (আঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) খ্রীষ্টপূর্ব ১০১৫-৯৭৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত শাসন করেন *(নবীদের কাহিনী ২/১৬৪পৃঃ)*। এছাড়াও খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ৭৮৭-৭৪৭ সাল পর্যন্ত আমুস নবী ও ৭৪৭-৭৩৫ সাল পর্যন্ত হোসি নবী ইহুদীদের বার বার সাবধান করেন *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৬৯ পৃঃ)*। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ সালে সামারিয়ার পতনের মধ্য দিয়ে ইহুদী রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান ২১ পৃ:)*। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে ইহুদীদের পরপর দুইবার নির্বাসিত হতে হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ সালে তারা ব্যাবিলন বাদশাহ বুখতে নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ফলে বুখতে নছর আবারও তাদেরকে আক্রমণ করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালায়। আর এই ঘটনাটি ঘটেছিল হযরত সোলাইমান (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর *(তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ৭৬৬ পৃঃ)*। এই আক্রমণে জেরুজালেমের পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইহুদী সাম্রাজ্যের পতন এবং তা খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ মতান্তরে ৫৩১ সালে ইরানী সম্রাট সাইরাসের (খসরুর) ঘোষণায় ইহুদীদের ব্যাবিলন নির্বাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্য দখল করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ সালে আলেকজা-ারের মৃত্যুর পর তার সকল সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়। এদের একজন সেলুকাস একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, যারা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ সালে ফিলিস্তীনের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে *(মাসিক পৃথিবী (জানুয়ারী ২০০০) ৫১ পৃঃ)*। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০ সালে এন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর আক্রমণ করে ৪০ হাজার ইহুদী হত্যা করে এবং ৪০ হাজারকে বন্দী করে গোলাম বানায় *(তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ৭৬৬ পৃ:)*। এরপর সেলুসিড নামক নতুন শাসকরা ইহুদীবাদ অনুশীলন নিষিদ্ধ করে এবং এর ফলে ফিলিস্তীনে ইহুদীরা বিদ্রোহ করে। অতঃপর ম্যাকাবী নামক বেশ কয়েকজন নেতার অধীনে ইহুদীরা সলুসিডদের থেকে স্বাধীনতা লাভ কওে এবং আবারও জেরুজালেমে ফিরে আসে। তারা সেখানে নতুন করে ইহুদী সভ্যতা গড়ে তোলে। সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫ সালে জুদাহ নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র টিকে থাকে। পরবর্তীতে খ্রীষ্টপূর্ব ৯৮ সালে সলুকী রাজ্যের শাসক তৃতীয় এন্টিউকাস ফিলিস্তীন অধিকার করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমান সৈন্যরা জুদাহে আগ্রাসন চালিয়ে তা রোম সাম্রাজ্যের অংশ করে নেয় এবং এই এলাকাকে তারা 'জুডিয়া' বলত *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৭৫-৭৬)*।

আবার খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ সালে ইহুদীরা হিরোডস নামের জনৈক ইহুদীর নেতৃত্বে প্রকাশ্যে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোম সম্রাট তাইতিস (যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান কোন ধর্মালম্বী ছিল না) ফিলিস্তীনে আক্রমণ করে শহরের সমস্ত উপাসনালয় ধ্বংস করে পুরো শহর পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে *(তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ৭৬৬ পৃঃ)*। এরপর ৭০ থেকে ১৩২ সালে টিটাস সামরিক শাসন প্রয়োগ করে কঠোরহস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। পরিশেষে তিনি ইহুদীদের আবারও পতন ঘটান এবং সেখানে ইহুদীদের ১ লক্ষ ৩৩ হাজার লোক নিহত হয় ও ৬৭ হাজার লোক বন্দী হয়ে কৃতদাসে পরিণত হয় *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৭৫-৭৬)*। আবারও ১৩৫ সালে রোমানরা ইহুদীদেরকে ফিলিস্তীন থেকে বিতাড়িত করে। সে সময় তারা এ এলাকার নামকরণ 'ফিলিসতিয়া'র পরিবর্তে 'ফিলিস্তীন' করে। ইহুদীরা এ সময় স্থায়ীভাবে ফিলিস্তীন ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ৫০০ বছর ফিলিস্তীন রোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে *(মাসিক পৃথিবী; জানুয়ারী, ২০০০; ৫২পৃঃ)*। এভাবে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের প্রভাব এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় যে, বিগত প্রায় দুই হাজার বছর ধরে তারা মাথা তুলবার কোন সুযোগ পায়নি *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/১৩১-১৩৩ পৃঃ)*।

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা সর্বপ্রথম ফিলিস্তীনকে করতলগত করে আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহের নেতৃত্বে। হযরত উমর (রাঃ) সশরীরে

উপস্থিত থেকে খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুজালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসলমানদের এই বিজয়ের পর সুদীর্ঘ ৫০০ বছর পর ইহুদীরা ফিলিস্তীনে তাদের উপাসনা-অর্চনা করার অধিকার ফিরে পায়। যে অধিকার তাদের কাছ থেকে রোমকরা কেড়ে নিয়েছিল। পরবর্তী ক্রুসেডারদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ৪০০ বছর যাবৎ ফিলিস্তীন রাষ্ট্র মুসলমানদের একচ্ছত্র অধিকারে ছিল।

১০০০ সাল থেকে ১০৭১ সালের মধ্যে সেলজুক নামক তুর্কী মুসলিম জনগোষ্ঠী ফিলিস্তীনের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সেখানে তাদের শাসনামল ৩০ বছরের কম সময় স্থায়ী হয়। ১০৯৬ সালে ইউরোপের খ্রীষ্টান কর্তৃক ক্রুসেড শুরু হয় এবং ১০৯৯ সালে তারা জেরুজালেম দখল করে। অতঃপর ১১৮৭ সালে মুসলিম শাসক গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ফিলিস্তীন আক্রমণ করেন এবং খ্রীষ্টানদের বিতাড়িত করে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ১২০০ শতকের মাঝামাঝি মামলুক নামক মিশরীয় শাসকরা একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যাতে এক সময় ফিলিস্তীনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তারা ১৫১৭ সাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় থাকে। ১৮০০ সালে পূর্ব ইউরোপে ইহুদীরা চরম নিপীড়নের শিকার হলে তারা ইহুদী উদ্বাস্তু হয়ে গণহারে দেশান্তরিত হয়ে ফিলিস্তীনে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ১৮৮০ সালে ফিলিস্তীনে বসবাসরত ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৫ হাজারে। এ সময় তারা জায়োনাবাদ নামক একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। এরপর ১৯১৪ সালে ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮৫ হাজারে। আর তখন সেসময়ে মুসলমান ফিলিস্তীনের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ। ১৯১৭ সালে বৃটেন তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ইহুদী সমর্থন লাভের জন্য The Balfour Declaration প্রকাশ করে, যা ১৯১৮ সালে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে ইহুদীদের জন্য একটি 'জাতীয় আবাসভূমি' গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো সমর্থন করে *(দৈনিক সংগ্রম ০১/০১/২০০১ইং)*।

অতঃপর ১৯২০-১৯২৩ সালে ফিলিস্তীনের বিভিন্ন ভূখণ্ড ইহুদীরা দখল করে নেয় এবং আরবরা ইহুদী বসতি স্থাপনের বিরোধিতায় আন্দোলন গড়ে তোলে *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/১৩৬)*। আবার ১৯৩০ সালে জার্মানীতে ইহুদী নির্যাতনের ফলে বিপুল সংখ্যক ইহুদী উদ্বাস্তু হয়ে ফিলিস্তীনে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ফিলিস্তীনের মুসলমানরা ও আরববিশ্ব বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশেষে বৃটেন ফিলিস্তীনে ইহুদী বসতি স্থাপন সীমিত করে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সকল আগন্তুক ইহুদীকে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইহুদীরা এই সিদ্ধান্তকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করে *(দৈনিক সংগ্রম, ০১/০১/২০০১ইং)*।

অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫ সালে) যুদ্ধ শেষের প্রাক্কালে নাৎসীরা প্রায় ৬০ লক্ষ ইউরোপীয় ইহুদীকে হত্যা করে। বেঁচে যাওয়া ইহুদীরা অনেকেই বিদেশে উদ্বাস্তু হয়। ফলে ১৯৪৭ সালে বৃটেন জাতিসংঘের নিকট ফিলিস্তীনের সমস্যা নিরসনের জন্য চূড়ান্তভাবে আহবান জানায়। ফিলিস্তীনকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার আহ্বানে জাতিসংঘের 'সাধারণ পরিষদ' ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালে মে মাসের ৪ তারিখে ইহুদীরা স্বাধীন 'ইসরাইল' রাষ্ট্রের ঘোষণা করে এবং বৃটিশরা ফিলিস্তীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর সেখানে ১৯৫১ সালে ৭ লক্ষ ইহুদী বসতি স্থাপন করে। ১৯৫৬-১৯৫৭ সালের আরব যুদ্ধের সময় ইহুদীরা ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা দখল করে। ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৭৩ সালে আবারও আরব-ইসরাইল যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে জুন মাসে যুদ্ধ বিরতি ঘটে এবং ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে ফিলিস্তীনে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে ও ইসরাইলী সৈন্য বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তীনীকে হত্যা করে *(মাসিক পৃথিবী, জানুয়ারী ২০০০, ৫৩ পৃঃ)*। এভাবেই ফিলিস্তীনে ইহুদীদের উত্থান-পতনের ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়।

এভাবে গোটা ইহুদী জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে তারা হ'ল ভীতু, কাপুরুষ, অভিশপ্ত ও হঠকারী এক নিকৃষ্ট জাতি। তাদের এই হঠতকারিতার ইতিহাস পবিত্র কুরআনে বার বার বিধৃত হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ 'হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমি মুকাদ্দাসে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করনা। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিয়ই আমরা প্রবেশ করব' *(মায়েদা ২১-২২)*। সুতরাং যে জাতি তাদের পবিত্র ভূমির সম্মান টিকিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখে না, তারা এখন কি করে সেই ভূমি নিজেদের বলে দাবী করে? তারা তো নিজেরাই অনীহা প্রকাশ করেছে। এমনকি তারা তাদের নবীর আদেশ পর্যন্ত উপেক্ষা ও অবহেলা করেছে। আর পরবর্তীতে যেহেতু সকল নবী ও তাদের উপর প্রেরিত ঐশী কিতাবে বিশ্বাসী মুসলমানরা ফিলিস্তীন অধিগ্রহণ করেছে এবং মহান আল্লাহ্র ঘোষণা অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী হ'ল এই উম্মতে মুহাম্মাদী এবং ইসলামের ইতিহাসে বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের দ্বিতীয় কেবলা হিসেবে আজও সমাদৃত ও সুপ্রসিদ্ধ *(ছহীহ বুখারী হা/৪১৩৪, কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়)*। সেহেতু আদিবাসী হিসেবে ফিলিস্তীন এলাকা মুসলমানদেরই সর্বাধিকার প্রাপ্য।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, ইহুদীদের উদাহরণ হ'ল বোঝা বহনকারী গাধার মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর যারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মত যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে মিথ্যা করে, তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না' *(জুম'আ ৬২/৫)*। এছাড়া ইহুদীরা মুসলমানদের চির শত্রু, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানরা তাদের আচার-আচরণকে অনুকরণ না করবে। যেমন- তিনি বলেন, 'আর ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন...' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। অথচ দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে এক শ্রেণীর মুসলমানরা এমনভাবে অনুসরণ করে চলেছে যে, বিপদের আশংকা আছে জেনেও তাদের গুহাতে প্রবেশ করতে একটিবারও দ্বিধাবোধ করেনা। ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এমনভাবে অনুসরণ করবে যে, এক বিঘত পরিমাণও ব্যবধান থাকবে না। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও তাতে প্রবেশ করতে শংকিত হবে না। ছাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খ্রীষ্টান? তিনি বললেন, তবে আর কে? *(ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৮*। অন্যত্র বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে ঐ জাতির মধ্যে গণ্য হবে' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। সুতরাং এ কথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, ইহুদীরা কপট জাতি। তারা মুখে এক কথা বলে এবং অন্তরে ভাবে আরেক কথা। তাদের প্রধান লক্ষ্য হ'ল যে কোন উপায় অবলম্বন করে মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদা নষ্ট করা। আর ঈমানী শক্তি একবার নষ্ট হয়ে গেলে সে মুসলমান দ্বারা যে কোন অপকর্ম করা সম্ভব। অতএব আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সচেতনতার সাথে ইহুদীদের কূটচালের হিংস্রতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। আসুন, আমরা ইহুদীদের কপটতার জাল ভেদ করে সম্মুখপানে অগ্রসর হই। যে পথ সুন্দর, সরল, সুদৃঢ় ও ঋজু। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন!!

লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

প্যাকেজ

আহসান সাদী আল-আদেল
চেমসফোর্ড, ইংল্যাণ্ড

১.

সময়টা এখন খুব কঠিন হয়ে গেছে। মানচিত্রের যেখানেই চোখ বুলানো হোক, সেখানেই একটা বিভাজন রেখা দিন দিন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সেই বিভাজনটা হক্ব এবং বাতিলের। চিত্রটা পুরো বিশ্বেই এক। আমাদের আটপৌরে জীবনেও সেটা ইদানীং প্রকট হয়ে উঠছে। দেশে যত নামধারী মুসলিম রয়েছেন তারা হক্ব এবং বাতিলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। যুগ যুগ ধরে চলে আসা জীবনযাত্রা আজ নানান বিভ্রান্তি, প্রতারণা আর হঠকারিতার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রবলভাবে। এর মধ্যে খুব কম মানুষই হক্ব আর বাতিলকে আলাদা করতে পারছেন। এই আঘাতটা অবশ্য সবসময়ই ছিলো। বর্তমানে চলতে থাকা দেশ এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনগুলো যেই আঘাতটা করে চলেছে, মিডিয়ার কল্যাণে আজ তা খুব প্রবল। এই ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে দেশে এখন যেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আশাবাদী হবার সুযোগটা খুব কম।

কলেজ জীবনে আমরা কয়েকজন বন্ধু প্রায়ই একসাথে বসে গল্প করতাম। আমাদের সেই আড্ডাগুলোর একটা প্রধান বিষয় ছিল চলমান অরাজক পরিস্থিতি থেকে দেশ কীভাবে উদ্ধার পাবে। অল্প বয়সের সেই গভীর আলাপে আমরা শেষপর্যন্ত আশাবাদী হয়ে আসর ছাড়তাম, ভাবতাম আগের প্রজন্মের করা ভুলগুলো পরবর্তী প্রজন্ম ঠিকই শুধরে নেবে। আমরা ভালো ভালো স্কুল কলেজে পড়ছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের প্রজন্মের মাধ্যমেই তো তবে দেশের পরিস্থিতির উন্নয়নটা হবে। কিছুদিন আগে সেই আড্ডার এক বন্ধুর সঙ্গে ফোনে আলাপ করছিলাম। দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে সে অনেক কথা বললো। এক পর্যায়ে আমাদের কলেজ জীবনের আড্ডার প্রসঙ্গ টেনে বললো যে যেই প্রজন্ম নিয়ে আমরা প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলাম সেই প্রজন্ম এখন আরো বেশী বিভ্রান্ত, আরো বেশী বিকৃত। সময়ের সাথে আমরা এগিয়ে যাইনি বরং উল্টো রাস্তা ধরে অনেক পেছনে চলে গেছি। এই বিপরীত স্রোতের মাঝেও প্রজন্মের একটা অংশ খুব ভালভাবে নিজেদের এগিয়ে নিতে পেরেছে এবং সেই সংখ্যাটা বড় নগণ্য। তার বক্তব্যের সাথে আমি পুরোপুরি একমত। এই প্রতিকূল স্রোতে ভেসে যাওয়া অংশের সাথে এগিয়ে যাওয়া অংশের পার্থক্যটা বেড়েই চলছে দিনদিন। হক্ব আর বাতিলের অবস্থানের মাঝামাঝি বিভাজনটা তাই বড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রায় প্রতিদিন হতাশাজনক একেকটা ঘটনা তাই সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। এমন কেনো হচ্ছে? এই এমন হয়ে যাওয়াটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলাফল। এই অধঃপতন প্রক্রিয়ার শুরুর সময়টাতে আমাদের অসচেতনতাটা এখানে দায়ী। এখন শুরু হয়েছে কেবল ফলাফল দেখার পর্ব। এখনও সঠিক পথ অনুসরণ না করলে ভবিষ্যতের ফলাফলটা আরো কতো করুণ হবে তা চিন্তাও করা যায়না।

২.

একটা শিশুর জন্মের পর থেকে তার পরিবার শিক্ষা দিতে শুরু করেন তাকে আধুনিক করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। এই গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় বাদ যায় না প্রায় কিছুই। হারমোনিয়াম দিয়ে গান শেখানো আর নাচের স্কুলে পাঠানোটা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সুরুচির নিদর্শন। সিম্পসন-সিনডারেলা আর মহাভারত-রামায়ণের কাহিনীর আদলে তৈরী 'ছোটা ভিম' টাইপ কার্টুন যেগুলো শিশুকে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, অশ্লীলতাকে সহজে গ্রহণ করা আর মনের মধ্যে শিরকের ধারণা জন্মানোর কাজ করে সেগুলো শিশুদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের দেশে এখন নূন্যতম দাবী। সাথে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব অ্যাকশন গেমস, একটা শিশুর কোমল সত্তাকে হিংস্র করে তোলার জন্যে যা যথেষ্ট। আমাদের আটপৌরে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে এগুলোই এখনকার লাইফস্টাইলের অনুষঙ্গ। এই পরিবারগুলোতে ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাটা থাকে গৌণ যার দৌড় কেবল বাসায় হুজুর রেখে সন্তানকে কিছু সূরা মুখস্থ করা আর আরবী বানান করে পড়তে শেখানো পর্যন্ত। অভিভাবকরা স্বপ্রণোদিত হয়ে আর খুব বেশী শেখাতে যান না (আসলে শেখাতে পারেন না) এবং কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে দাদী-নানীর কাছ থেকে শিখতে পাঠান। বাড়ীর দাদী-নানীদের ইসলাম জানার উৎস 'বিষাদ সিন্ধু' বা 'ফাযায়েলে আমল' টাইপ কিছু ভয়ংকর পুস্তক।

একটা সন্তান বড় হতে থাকে তাই এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়। অতি অল্প রসদ নিয়ে বড় হয়ে সেই সন্তানটি যখন ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে চলে আসে তখন শুরু হয় আরেক নতুন খেলা। অযত্নে বেড়ে উঠা সেই ছেলেমেয়েদেরকে বোঝানো হয় তারা যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে এবং তারা নিজের ভালোটা বেশ ভালোই বুঝে নিতে পারে। তাদের চোখ তখন আড়াল হয়ে যায় রঙীন চশমার আড়ালে। তারা ফ্রি-মিক্সিং, সমাজতন্ত্র, 'ধর্ম যার যার- রাষ্ট্র সবার' থিওরী, বন্ধু-আড্ডা-গান, গিটার, প্রেম, নেশা, দেশপ্রেমের ফাঁকা বুলি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতার চেতনা, জাতীয়তাবাদ, মেটালিকা, বেসবাবা ইত্যাদির প্রবল চাপে পারিবারিকভাবে পাওয়া নূন্যতম ধর্মীয় বোধটা আর টিকিয়ে রাখতে পারে না। ফলাফল, কোনো রক্ত গরম করা কথায় কিংবা কোনো মধুর বানীর ধোঁকায় এই প্রজন্ম চোখ বুজে ঝাপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। এমন একটা তরুণ প্রজন্মের কাছে ভালো কিছু আশা করার সুযোগটা কই!

আমার সময়ের কথিত 'তরুণ প্রজন্ম' কি মনে করে যারা স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের ইচ্ছেগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে তারা বেকুব, বোকা আর গর্ধব? তারা কি কিছু না বুঝেই এমনটা করেছে নাকি এমন কিছু তারা বুঝতে পেরেছে যা এখনও বাকীদের জানা হয়নি। জীবনটা কি কেবল উপভোগের, নাকি উপলব্ধির কিছু আছে এখানে?

৩.

জীবন বিপন্ন অবস্থায় বার্মার অসহায় মুসলমানরা আমাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলো। আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। আমরা ভেবেছি তাদের আশ্রয় দিলে আমাদের খাদ্য ঘাটতি হবে, ক্রাইম বেড়ে যাবে, পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের উপর গোস্বা করবে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম রিযিকের মালিক আল্লাহ, আমরা নই। আল্লাহ আমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করে নিলেন এবং আমরা তাতে বিপুলভাবে হেরে গেলাম। আমরা তাদের ভয়ার্ত আর ফ্যাকাশে অসহায় মুখগুলোর ছবি দেখেছি মিডিয়ায়। তবুও আমাদের কোনো অনুশোচনা বা কষ্ট হয় না। সেসব অসহায় মানুষ বুকফাটা আর্তনাদ করেছিলো, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলো। সেই মযলুমের অভিশাপ কি আমাদের উপর একদমই আসবে না? এতটা কীভাবে আমরা আশা করি!

আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলা এখন সাধারণ ঘটনা। এভাবে কোনো মানুষ মারা হলে তার ভিডিও দেখে আমরা কষ্ট পাই। পরবর্তীতে যখন জানি যে সেই ছেলেটা শিবির করতো তখন আমাদের সেই কষ্টবোধটা নিমিষেই হাওয়া হয়ে যায়। শিবির করলে তাকে মেরে ফেলতে হবে কেনো? সেই মেরে ফেলাটা আবার আমাদের কাছে 'জাস্টিফাইড' হয় কীভাবে? মানুষ হিসেবে কতটা অধঃপতন হলে এমন জঘন্য চরিত্র তৈরী হয় তা বোধগম্য নয়। গণতন্ত্রের সৈনিকরা একে অপরকে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরে ফেলে, সিসি ক্যামেরার রেকর্ড দেখে আমরা খুনীর সহজ আর নির্লিপ্ত ভাবটা ধরতে পারি। বুঝতে পারি মানুষ মারা তার কাছে কত সহজ একটা

কাজ। হাযার মানুষের সামনে তরুণ প্রজন্ম লগি বৈঠা নিয়ে পিটিয়ে শিবিরের ছেলেদের মেরে ফেলেছিলো, বিশ্বজিৎকে কুপিয়ে মেরে ফেললো। এই প্রজন্ম মানুষ মারাটাকে উৎসবের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেনো। এছাড়া চলন্ত ট্রেন থেকে মানুষ ফেলে দেয়াটা নাকি ইদানীং সম্মান বাড়ানোর একটা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ দিয়ে মতিঝিলে হুযূরদের হত্যা করার বিষয়টা আমাদের কাছে কোনো কাহিনীই না। আমরা মৃতের সংখ্যা নিয়ে বাৎচিতেই নিজেদের জয়ী মনে করছি। মাদ্রাসার ছাত্র আর হাফেযরা কুরআন পুড়িয়েছে এমন জঘন্য মিথ্যাচার আমরা অবলীলায় বিশ্বাস করছি। তেমনি আজ সিরিয়া বা মিশরে এত হতাহতের বিষয়গুলো আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেনা। তাদের কষ্টে আমাদের কান্না আসে না। এমন জঘন্য অবস্থায় ভালোমতো চিন্তা করাটা শুরু করে দিতে হবে। এগুলো মুসলিমের বৈশিষ্ট্য নয়।

অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ব্যভিচারের 'ইন্ডিকেটর'গুলো আমাদের সামনে সবসময়ই দৃশ্যমান। রাস্তার বিলবোর্ড থেকে ঘরের টেলিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র অশ্লীলতার জয়জয়কার। পার্ক, সাইবার ক্যাফে, 'লিটনের ফ্লাট', সুন্দরী প্রতিযোগিতা, কনসার্ট, মডেলিং, বি.এফ, জি.এফ, ব্রেকআপ, রিলেশন এগুলো এখন তরুণ প্রজন্মের কাছে ধর্মের মতো একটা কিছু। আজকের এই সস্তা 'কালচারে'র শুরুটা বেশ আগেই হয়েছে। সাদাকালো টিভির যুগে বাসায় সবাই একসাথে বসে টিভি দেখার সময় বিজ্ঞাপন আসলেই পর্দা কালো করে দেয়া হতো যাতে নাচ-গানগুলো বাচ্চারা দেখতে না পায়। এখন পারিবারিকভাবে এগুলো অবলীলায় দেখা হয়। পতনটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়।

আজকের তরুণ প্রজন্ম অবশ্য এসবে কান দেয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যে তারা মেধা-শ্রম উজাড় করে দিতে প্রস্তুত কিন্তু ইসলামটা তবু জানা হয় না তাদের। ইসলামের ব্যাপ্তিটা তাদের কাছে কেবল ঈদ ফ্যাশন, এয়ারটেলের ঈদের নাটক এইসব পর্যন্তই। এই তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কি কোনো স্বপ্ন দেখা সম্ভব? আমাদের দেশের সাম্প্রতিক এই করুণ অবস্থাগুলো কি আমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল নয়?

৪.

পত্রপত্রিকা বা বইয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন গুণীজনের জীবন আলোচনা পড়লে একটা বিষয় খুব নিশ্চিতভাবে কমন পাওয়া যায় সেটা হলো '...এত সালে এই মহান ব্যক্তি অমুক এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন'। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই তাদের জীবনে বেশীরভাগ সময়ই তারা ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করেন না। মুসলিম পরিচয়টার পেছনে জীবনে ইসলাম না থাকাটা কি ইসলামের সীমাবদ্ধতা, নাকি সেই মহান ব্যক্তির ইসলাম না জানার বিষয়টা দায়ী এটা আমাদের বোঝা উচিত। ইসলাম একটা পরিপূর্ণ প্যাকেজ। এর বাইরে একই সাথে অন্যান্য প্যাকেজ অনুসরণ করলে যা হবে সেখানে বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নেই। সাধারণ মুসলিম মাত্রই এটা মেনে নিতে হবে। পরিপূর্ণ প্যাকেজ না মানার কারণটা স্রেফ প্যাকেজটা না জানার ফলাফল। ইসলাম অনুসরণ করে কেউ জাতীয়তাবাদের গান গাইতে পারে না, গণতন্ত্রে সমাধান খুঁজতে চায় না, মঙ্গল শোভাযাত্রা করতে পারে না, মাযারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারে না। তবুও এসব হয় কেবল না জানার কারণে।

ইসলাম শিক্ষার বিষয়টা পরিপূর্ণ হওয়া তাই আবশ্যক। ইসলাম শেখাটা কেবল সূরা মুখস্থ করা আর আরবী রিডিং পড়তে পারা নয়। জানতে হবে ইসলামের ইতিহাস, তাওহীদের অর্থ, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মানুষদের জীবন। কীভাবে রাসূল (ছাঃ) ইসলাম প্রচার করেছেন, ছাহাবীরা কীভাবে তা পালন করেছেন এটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জানতে হবে কুরআনের বাণী সম্পর্কে। ভালো ভালো তাফসীর আর হাদীছের বই এখন বাংলায় পাওয়া যায়। এসব থেকে কুরআন আর সুন্নাহ সম্পর্কে জেনে তা জীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইসলাম শিক্ষার একদম নূন্যতম দাবী। এগুলো দিয়ে ইসলাম জানার প্রক্রিয়া কেবল শুরু হয়। এই বিষয়গুলো ছেড়ে প্রচলিত বিষাদ সিন্ধু, ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ, ওয়াযিফা, মিলাদ, খতম পড়ানো, পীর-দরবেশ, ঈদে মীলাদুন্নবী, ফাতেহা ই-ইয়াজদহম, ফাযায়েলে আমল, শবে বরাত ইত্যাদি কালচার থেকে ইসলাম জানার আর মানার চেষ্টা করলে জেনে নেয়া উচিত, এসব আদৌ ইসলাম নয়।

যারা ইসলাম বিশ্বাস করেন না তাদের কথা আলাদা। যারা কড়কড়ে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবী-পায়জামা পরে অন্তত জুম'আর ছালাত আর ঈদের ছালাত আদায় করেন তাদের ক্ষেত্রে যদি ধরে নেই যে তারা বিশ্বাসী তবে তাদেরকে ইসলাম জানতেই হবে। আপনি মুসলিম পরিচয় দিচ্ছেন যেহেতু, সেহেতু আপনাকে অবশ্যই এর বেসিকটা অন্তত জানতে হবে। পরিবারে ওই নূন্যতম ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ছাড়া মুসলিম কীভাবে হবেন? তাওহীদ না জেনে কেবল ঈদ আর জুম'আ'র ছালাত দিয়ে কোনো কাজ হবার কথা না। নিজে জানার চেষ্টা করতে হবে এবং পরিবারকে জানাতে হবে, সন্তানকে শেখাতে হবে।

অন্তত বেসিকটা জানতে পারলে একজন মুসলিম তরুণ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে বাধা দেয়ার কারণে ঐশীর মতো নিজের বাবা-মাকে হত্যা করতে পারবে না। সে ইয়াবার নেশায় মত্ত হবে না। একজন তরুণী লাক্স সুন্দরী হবার জন্যে নাম নিবন্ধন করবে না। রাজপথ কাঁপানো সন্ত্রাসী বা গণতন্ত্রের সূর্যসৈনিক কোনো ছাত্রনেতা হবার চেষ্টা করবে না। রেজাল্ট খারাপ করে আত্মহত্যা করবে না। পার্কের শীতল পরিবেশ প্রেম-প্রেম খেলায় গরম করে তুলবে না। রাসূল (সাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তি করবে না। একজন সাধারণ মুসলিম তো সন্তানকে এগুলো থেকেই বেঁচে থাকতে বলবেন। ন্যূনতম ইসলাম শিক্ষা নিশ্চিত করুন, কেবল এগুলোই তখন প্রাপ্তি হবে না, ইনশাআল্লাহ পরকালে যেই প্রতিদান পাবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। একজন মুসলিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে আল্লাহর ইবাদতের জন্য, যাতে পরকালে জান্নাত পাবার আর জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থাটা করা যায়। এজন্যে সেই রাস্তাটা তো জানতে হবে প্রথমে। সঠিক রাস্তায় চলার ব্যাপারটা বেশ কঠিন যদি পর্যাপ্ত জ্ঞানটা না থাকে। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বাতিলটা বড় সহজলভ্য আর আকর্ষণীয়। অল্পজ্ঞানের একটা তরুণ তাই অতি সহজে ধোঁকায় পড়ে যায়। সন্তানকে পৃথিবীর কর্দমাক্ত রাস্তায় ছেড়ে দেবার আগে ঈমান নিয়ে টিকে থাকার পর্যাপ্ত রসদটুকু সরবরাহ না করলে সে বিভ্রান্ত হবেই।

৫.

আমাদের সেলিব্রিটি কারা হবেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু। একজন মুসলিম তো তাকেই সেলিব্রিটি হিসেবে মেনে নেবে যারা কুরআন-সুন্নাহকে প্রচণ্ডভাবে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের চাইতে আর কে অগ্রগামী? একেকজন ছাহাবীর জীবন একেকটা মহাকাব্য যেনো। একজন মুসলিম যদি ছাহাবীদের জীবন সম্পর্কে না-ই জানেন তাহলে তো তাদের কাছে ভ্রান্ত লোকেরাই সেলিব্রিটি হিসেবে আসন গেড়ে নেবে। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে একটা সময় এস.এস.সি বা এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারভিউ ছাপা হতো। এখনও হয় সম্ভবত। তাতে সেই মেধাবীর 'প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে?' এমনটা জানতে চাইলে অনেকেই বলতো মুহাম্মদ (ছাঃ)। এই কথাটা কেবল মুখে বলা পর্যন্ত না, কাজে প্রমাণ করাটাই ইসলামের দাবী।

এইসব দাবীগুলোর পূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্যে ইসলামকে পরিপূর্ণ প্যাকেজ হিসেবে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। অল্প অল্প ইসলাম, খানিকটা প্রগতিশীলতা, একটু গণতন্ত্র, সামান্য সমাজতন্ত্র আর এসব মিলে যেই ককটেলটা হয় তা কেবল আমাদের তরুণ প্রজন্মকে অতল গহবরেই নিয়ে যায়। আজকের এই অশান্ত আর অস্থির সময়ে অভিভাবকদেরকে তাই নতুন করে চিন্তা করতে হবে। এতদিন ধরে অনুসরণ করে আসা রাস্তাটা যে সঠিক ছিলো না তা বুঝে নিতে আর যেনো দেরী না হয়।

তওবার দরজা আল্লাহ বন্ধ করে দেন নি। এখনও সময় আছে, জীবিত থাকা অবস্থায় ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের। আল্লাহ আমাদের হেদায়াতের রাস্তা অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমীন!

অমুসলিমদের যবানীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-৩

অনুবাদ : আব্দুল হাসীব

(শেষ পর্ব)

১. বৃটিশ নারী অধিকার কর্মী, সমাজতত্ত্ববিদ ও লেখিকা **এ্যানি বেসান্ত** (১৮৪৭-১৯৩৩) বলেন, "It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme. And although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel whenever I re-read them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher." *(*Annie Besant *,The Life And Teachings of Muhammad,* Madras, 1932, p. 4*).*

'কোন ব্যক্তি যে আরবের মহান নবীর জীবনী ও চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যে জানে কিভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন কিংবা জানে তার যাপিত জীবন সম্পর্কে, তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে, সে সর্বশক্তিমানের প্রেরিত অন্যতম দূত এই মহান নবী সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করবে। যদিও এ বিষয়ে আমার কথাগুলি অনেকের কাছেই পরিচিত মনে হতে পারে। তবুও বলব, যখনই আমি তাঁর সম্পর্কে পুনর্বার পড়ি, তাঁর প্রতি নতুনভাবে প্রশংসার স্থান খুঁজে পাই, নতুনভাবে অনুভব করি সেই শক্তিমান আরবীয় শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা'।

২. বিখ্যাত জার্মান কবি, নাট্যকার, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ **জে.ডব্লিউ. গ্যেটে** (১৭৪৯-১৮৩২) বলেন, He is a prophet and not a poet and therefore his Koran is to be seen as Divine Law, and not as a book of a human being made for education or entertainment *(Johann Wolfgang Goethe, Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WAI,7,32; translator unknown).*

'তিনি একজন নবী, কবি নন এবং সেই কারণেই তাঁর কুরআনকে দেখা হয় 'স্বর্গীয় আইন' হিসাবে, মানুষের তৈরী কোন শিক্ষা বা বিনোদনমূলক গ্রন্থ হিসাবে নয়।

৩. নেদারল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরবর্তীতে ইসলামগ্রহণকারী নওমুসলিম **ক্রিশ্চিয়ান স্নোক হারগ্রোঞ্জে** (১৮৫৭-১৯৩৬) বলেন, The league of nations founded by the prophet of Islam put the principle of international unity and human brotherhood on such universal foundations as to show candle to other nations...the fact is that no nation of the world can show a parallel to what Islam has done towards the realization of the idea of the League of Nations (Christian Snouck Hurgronje, as quoted in *Encyclopaedic Survey of Islamic Culture* (1997) by Mohamed Taher, p. 260).

'ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'লীগ অফ নেশনস' বা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' স্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং মানবিক ভ্রাতৃত্বের মূলনীতি। আর সে মূলনীতি এমনই বৈশ্বিক ও সার্বজনীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা অন্যান্য জাতিকেও আলোর পথ দেখিয়েছে....বাস্তবিকই বিশ্বের কোন জাতিই 'জাতিসংঘ'-এর ধারণা উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইসলামের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

৩. বৃটিশ আমেরিকান ঐতিহাসিক এবং লণ্ডনের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরেটাস **বার্নার্ড লুইস** (জন্ম : ১৯১৬ইং) বলেন, He had achieved a great deal. To the pagan peoples of western Arabia he had brought a new religion which, with its monotheism and its ethical doctrines, stood on an incomparably higher level than the paganism it replaced. He had provided that religion with a revelation which was to become in the centuries to follow the guide to thought and count of countless millions of Believers. But he had done more than that; he had established a community and a well organized and armed state, the power and prestige of which made it a dominant factor in Arabia.... The modern historian will not readily believe that so great and significant a movement was started by a self-seeking imposter. Nor will he be satisfied with a purely supernatural explanation, whether it postulates aid of divine of diabolical origin; rather, like Gibbon, will he seek 'with becoming submission, to ask not indeed what were the first, but what were the secondary causes of the rapid growth' of the new faith...(Bernard Lewis, *The Arabs in History* (1950), p.45-46)

'তিনি প্রভূত কিছু অর্জন করেছিলেন। পশ্চিম আরবের পৌত্তলিকদের নিকট তিনি পৌত্তলিকতার স্থলে এমন এক নতুন ধর্মের আহ্বান নিয়ে এসেছিলেন যা স্রষ্টার একত্ব এবং নৈতিক বিধি-বিধানের দিক থেকে পৌত্তলিকতার বহুগুণ উর্ধ্বে এক অতুলনীয় উচ্চতায় অবস্থান করছিল। তিনি সেই ধর্মের সাথে এমন এক ঐশীবাণী সরবরাহ করেছিলেন যা অনাগত শতাব্দীগুলোতে অগণিত লক্ষ লক্ষ ঈমানদার মানুষের চিন্তাধারার পথপ্রদর্শক হতে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তার চেয়ে আরো বেশীই করেছেন। তিনি একটি সম্প্রদায় এবং একটি সুসংগঠিত ও সমরশক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা এই রাষ্ট্রটিকে ক্ষমতা ও মর্যাদার বলে আরবের একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত করেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এটা অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করতে রাজি হবেন না যে, এত বিশাল এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল একজন 'স্বার্থান্বেষী ভণ্ডে'র মাধ্যমে। আবার এমন অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাও সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন না যে, এটা সম্ভবত একটা শয়তানী শক্তির স্বর্গীয় সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। বরং তারা গীবনের মত নতুন এই বিশ্বাসের বিস্ময়কর দ্রুতগামী অগ্রযাত্রাকে অবনত মস্তকে স্বীকৃতি

দেয়ার পর এর পিছনের মুখ্য কারণগুলো অনুসন্ধান না করে গৌণ কারণগুলো খুঁজতে থাকবেন'।

৪. লণ্ডনের এ্যাংলিকান চার্চের খণ্ডকালীন পাদ্রী, প্রাচ্যবিদ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা শিক্ষক (১৮৫৮-১৯৪০) **ডেভিড স্যামুয়েল মারগোলিউথ** তাঁর 'মুহাম্মাদ এবং ইসলামের বিকাশ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, I regard Mohammed as a great man, who solved a political problem of appalling difficulty, — the construction of a state and an empire out of the Arab tribes. I have endeavored, in recounting the mode in which he accomplished this, to do justice to his intellectual ability and to observe towards him the respectful attitude which his greatness deserves (D. S. Margoliouth, *Mohammed and the Rise of Islam* (1905), Preface)

'আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে একজন মহামানব হিসাবে বিবেচনা করি। যিনি আরবীয় গোত্রসমূহকে একটি রাষ্ট্রে এবং একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করে এক ভয়ংকর সংকটাপন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। আমি এই গ্রন্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কোন পদ্ধতিতে তিনি এই সুকঠিন কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা পুনর্নিরীক্ষণ করতে, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার প্রতি সুবিচার করতে এবং তাঁর মহত্ব যে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লাভের যোগ্য তা প্রদান করতে'।

৫. ইণ্ডিয়ার প্রখ্যাত কবি, লেখক, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ **সরোজিনী নাইডু** (১৮৭৯-১৯৪৯) বলেন, It was the first religion that preached and practiced democracy; for, in the mosque, when the call for prayer is sounded and worshippers are gathered together, the democracy of Islam is embodied five times a day when the peasant and king kneel side by side and proclaim: 'God Alone is Great'... I have been struck over and over again by this indivisible unity of Islam that makes man instinctively a brother (Sarojini Naidu, *Ideals of Islam*, vide *Speeches & Writings* (1918), p. 169)

'ইসলামই ছিল প্রথম ধর্ম যা গণতন্ত্রের প্রচার ও অনুশীলন করেছে। যেমন মসজিদে ছালাতের জন্য আযান দেয়ার পর মুছল্লীরা একসাথে মসজিদে একত্রিত হয়। দৈনিক এই পাঁচ ওয়াক্তের ছালাতের মধ্যেই ইসলামের গণতন্ত্র নিহিত রয়েছে যেখন কৃষক এবং রাজা পাশাপাশি নতজানু হয়ে একই ঘোষণা উচ্চারণ করে বলে, 'আল্লাহু আকবার' (এক আল্লাহ মহান)। ইসলামের এই বিমূর্ত একতা দেখে আমি বার বার হতবাক হয়ে যাই যা একজন মানুষকে সহজাতভাবেই একজন ভাইয়ে পরিণত করে'।

৬. ইণ্ডিয়ান দার্শনিক, মনোবিদ ও অধ্যাপক **রামাকৃষ্ণ রাও** (জন্ম : ১৯৩২ইং) লিখেছেন, The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes. There is Muhammad the Prophet. There is Muhammad the Warrior; Muhammad the Businessman; Muhammad the Statesman; Muhammad the Orator; Muhammad the Reformer; Muhammad the Refuge of Orphans; Muhammad the Protector of Slaves; Muhammad the Emancipator of Women; Muhammad the Judge; Muhammad the Saint. All in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is alike a hero. (K. S. Ramakrishna Rao, in *Muhammad the Prophet of Islam*, 1979).

'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সত্যটা জানা সর্বাধিক কঠিন একটি কাজ। এর কিঞ্চিৎমাত্র আমি ধারণ করতে পারি। ছবির মত দৃশ্যপটে কি নাটকীয় এক পর্যায়! যেখানে একজন নবী মুহাম্মাদ, একজন যোদ্ধা মুহাম্মাদ, একজন ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ, একজন রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদ, একজন বাগ্মী মুহাম্মাদ, একজন সংস্কারক মুহাম্মাদ, একজন এতীমের আশ্রয়স্থল মুহাম্মাদ, একজন ক্রীতদাসের রক্ষাকবচ মুহাম্মাদ, একজন নারী মুক্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদ, একজন বিচারক মুহাম্মাদ, একজন সাধু মুহাম্মাদ-ইত্যাদি সর্বরকম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়েই তিনি উপস্থিত। মানবীয় কর্মকাণ্ডের এ সকল দিক ও বিভাগে এমন সব চমকপ্রদ ভূমিকায় তাঁর অবস্থান সত্যিই একজন নায়কের মত।

৭. ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক **নেপোলিয়ান বোনাপার্ট** (১৭৬৯-১৮২১) বলেন, "I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of Qur'an which alone are true and which alone can lead men to happiness." *(Nepolean Bonaparte – Quoted in Christian Cherfils BONAPARTE ET ISLAM (PARIS 1914).*

'আমি আশা করি এমন একটি সময় বেশী দূরে নয় যখন আমি সকল দেশের সকল বুদ্ধিজীবি এবং বিদ্যান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ঐক্যমত গড়ে তুলতে পারব এমন একটি একক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, যা কেবল পবিত্র কুরআনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ হল, কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সত্য এবং মানুষকে সুখ-শান্তির পথে পরিচালিত করে'।

৮. মেজর আর্থার **গ্লীন লিউনার্ড** বলেছেন, 'মুহাম্মদ (ছাঃ) এমন একজন মানুষ যিনি শুধু মহৎ ছিলেন না; বরং মহোত্তমদের অন্যতমও ছিলেন। তিনি শুধু নবী হিসাবেই নন; দেশপ্রেমিক ও নেতা হিসাবেও মহান ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা; তিনি গঠন করেছেন একটি মহান জাতি ও এক বিশাল সাম্রাজ্য। কিন্তু এসব ছাড়াও তিনি এমন একটি বিষয় নির্মাণ করে গেছেন, যা তুলনাহীন। আর তা হল, একটি ধর্মবিশ্বাস। তিনি সত্য ছিলেন, সত্য ছিলেন নিজের কাছে, তার অনুসারী ও পরিচিতজনদের কাছে এবং সর্বোপরি তার আল্লাহর কাছে'।

'মুহাম্মাদ (ছাঃ) তিনটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, যা তখনকার দিনে ছিল না বললেই চলে। ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে তার অসামান্য মেধা, রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তার অনন্য সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসক হিসাবে তার অতুলনীয় দক্ষতা'।

'পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন মানুষ আল্লাহকে দেখে থাকেন, বুঝে থাকেন ও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোন উপকার করে থাকেন, তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি হচ্ছেন আরবের ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ' *(Major Arthur Glyn Leonard, 'Islam, Her Moral and Spiritual Values')*।

[লেখক : কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

A Sacred Conversation

Yasmin Mogahed

There is a time of night when the whole world transforms. During the day, chaos often takes over our lives. The responsibilities of work, school, and family dominate much of our attention. Other than the time we take for the five daily prayers, it is hard to also take time out to reflect or even relax. Many of us live our lives at such a fast pace, we may not even realize what we're missing.

But there is a time of night when work ends, traffic sleeps, and silence is the only sound. At that time—while the world around us sleeps—there is One who remains awake and waits for us to call on Him. We are told in the *hadith qudsi*: "Our Lord descends during the last third of each night to the lower heaven, and says: 'Is there anyone who calls on Me that I may respond to him? Is there anyone who asks Me that I may give unto him? Is there anyone who requests My Forgiveness that I may forgive him?'" (Bukhari and Muslim)

One can only imagine what would happen if a king were to come to our door, offering to give us anything we want. One would think that any sane person would at least set their alarm for such a meeting. If we were told that at exactly one hour before dawn a check for $10,000,000 would be left at our doorstep, would we not wake up to take it?

Allah *subhanahu wa ta`ala* (exalted is He) has told us that at this time of night, just before dawn, He will come to His servants. Imagine this. The Lord of the universe has offered us a sacred conversation with Him. That Lord waits for us to come speak with Him, and yet many of us leave Him waiting while we sleep in our beds. Allah (swt) comes to us and asks what we want from Him. The Creator of all things has told us that He will give us whatever we ask.

And yet we sleep.

There will come a day when this veil of deception will be lifted. The Qur'an says: "[It will be said], You were certainly in unmindfulness of this, and We have removed from you your cover, so your sight, this Day, is sharp." (Qur'an 50:22).

On that Day, we will see the true reality. On that Day, we will realize that two *rak`at* (units) of prayer were greater than everything in the heavens and the earth. We will realize the priceless check that was left on our doorstep every night as we slept. There will come a day when we would give up everything under the sky just to come back and pray those two *rak`at*.

There will come a day when we would give up everything we ever loved in this life, everything that preoccupied our hearts and minds, every mirage we ran after, just to have that conversation with Allah. But on that Day, there will be some from whom Allah (swt) will turn away… and forget, as they had once forgotten Him.

The Qur'an says: "He will say, 'My Lord, why have you raised me blind while I was [once] seeing?' [Allah] will say, 'Thus did Our signs come to you, and you forgot them; and thus will you this Day be forgotten.'" (Qur'an, 20:125-126) In Surat al-Mu'minoon, Allah says: "Do not cry out today. Indeed, by Us you will not be helped." (Qur'an, 23:65)

Can you imagine for a moment what these *ayat* (verses) are saying? This is not about being forgotten by an old friend or classmate. This is about being forgotten by the Lord of the worlds. Not hellfire. Not boiling water. Not scalded skin. There is no punishment greater than this.

And as there is no punishment greater than this, there is no reward greater than what the Prophet describes in the following *hadith*:

"When those deserving of Paradise would enter Paradise, the Blessed and the Exalted would ask: Do you wish Me to give you anything more? They would say: Hast Thou not brightened our faces? Hast Thou not made us enter Paradise and saved us from Fire? He would lift the veil, and of things given to them nothing would be dearer to them than the sight of their Lord, the Mighty and the Glorious." [Sahih Muslim]

But one does not need to wait until that Day to know the result of this nighttime meeting with Allah (swt). The truth is, there are no words to describe the overwhelming peace in *this* life from such a conversation. One can only experience it to know. Its effect on one's life is immeasurable. When you experience *qiyam*, the late night prayer the rest of your life transforms. Suddenly, the burdens that once crushed you become light. The problems that were irresolvable become solved. And that closeness to your Creator, which was once unreachable, becomes your only lifeline.

[Writer : Dawah worker & speaker, USA]

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান

মেহেদী আরীফ

বাঙালী মুসলমান সবসময় একপা এগিয়ে দুইপা পিছিয়েছে। শিক্ষার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, চাটুকারিতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার সবকিছু কুরে কুরে খেয়েছে বাঙালির মস্তিষ্ক। তাই এদের মাথা ভরে গেছে গুবরে পোকায়, সবসময় মাথা থেকে বের হয়েছে গুবরে পোকার মিছিল। বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানেরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানেরা ঈর্ষাপরায়ণ। পাছে লোকে কিছু বলে, হবে কি হবেনা এরকম ভাব বাঙালির মনে আসন গেড়েছে, ফলাফল যথারীতি শূন্য। বাঙালি মুসলমান আজ পিছনের বেঞ্চে ঘুমায়, ঝিমায়, আর ভুল বকে অনবরত, কিন্তু বুক ফুলিয়ে চলতে চায়। নিজের ভাগে কম পড়লে এরা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়। এমন ঘুণেধরা বাঙালি মুসলমানের মনে চেতনার দীপশিখা জ্বালিয়ে দিতে যুগে যুগে কিছু মুসলিম সাহিত্যিক এসেছেন ধরায়, জ্বালিয়েছেন মুসলিম মনের মাঝে ইসলামী চেতনার দীপশিখা, কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বোধকরি তাদের ভিতরে এক অনন্যসাধারণ পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি, গণশক্তি, সাম্য, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকার'। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগমন অনেকটা ধূমকেতুর মতই অকস্মাৎ। নিম্নে এই মহান কবির সাহিত্য প্রতিভা ও মুসলিম সমাজে ইসলামের আত্ত প্রেরণা জাগিয়ে তোলায় তার অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

নজরুল ও কিছু কথা :

কিছু মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ প্রতিভা নিয়ে জন্মান। শিম গাছের মত যারা বেড়ে ওঠেননা, বরং খেজুর গাছের মত শক্ত সমর্থ হয়ে মাউন্ট এভারেস্টের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চান। খেজুর গাছে কাঁটা থাকে তাই ছাগলেও খেজুর গাছকে এড়িয়ে চলে, পাছে কাঁটা বিধে যায়! খেজুর গাছের মত নজরুল মানুষের মনে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে তার বিবেককে আন্দোলিত করতে চেয়েছিলেন। ফররুখ আহমেদ, গোলাম মোস্তফা, মাওলানা আকরম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাঙালি মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের ভিতরে পঞ্চরত্ন যারা মুসলিম জাতিসত্তা নিয়ে ভেবেছিলেন, সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে মুসলিম জাগরণকে বেগবান করতে চেয়েছিলেন। যদিওবা অনেক সময় চরমপন্থী কতিপয় মুসলমানের অভিযোগের তীর তাদের দিকে ধেয়ে এসেছে। যেমনভাবে নজরুল একটি অভিভাষণে আক্ষেপ করে বলেছেন– "কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি"।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল যে নজরুল একজন অসাম্প্রদায়িক কবি যিনি সাধারণ মানুষের জন্য লিখেছেন, মানবতার গান গেয়েছেন, স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছেন। যার স্বীকৃতিস্বরূপ নজরুলকে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে এনেছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নজরুলকে আজ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে নজরুলের অবস্থান দেখলে মনে হবে যে আকাশের সবচেয়ে কম দীপ্তিমান তারাটি হল নজরুল, নিভু নিভু আলোয় কোনমতে টিকে আছেন। অনেকটা নিজ ঘরে পরবাসী হয়ে। আমরা নজরুলকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করেছি সত্য কিন্তু মনের দিক দিয়ে মেনে নিতে পারিনি কিংবা তাকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। নজরুলকে আমরা উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁর থেকে মই কেড়ে নিয়েছি। তাইতো তাঁর দশা হয়েছে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির মত, সব কাজ তাঁর নামে হয় কিন্তু তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাত তুলে মোনাজাত করা ভিন্ন বাড়তি কিছু করার ক্ষমতা পান না। এ যাবৎকাল নজরুলের উপর পিএইচ.ডি করেছেন মাত্র দুইজন গবেষক। একজন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও অন্যজন হলেন করুণাময় গোস্বামী। নজরুলের উপর পঠনপাঠন বেশ কম-ই হয়েছে বলতে হবে। নজরুল যে বিদ্রোহের গান গেয়েছিলেন সেই বিদ্রোহ আজ রহিত হয়ে গেছে, বাঙালি মুসলমান আজ নির্জীব-অসার। এরা প্রতিবাদ করবে কি, এরা তো জানেই না তাদের প্রতিবাদের বিষয়টি কি!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিলেবাসে নজরুল :

নজরুল ছিলেন ভীষণভাবে অসাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন তিনি। অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই বাঙালি কিংবা বাংলাদেশী যাই বলিনা কেন, মানুষের শ্রদ্ধা অনেকটাই টিকে আছে। সাম্প্রদায়িক হলে তাঁর নাম হারিয়ে যেত অন্ধকার গহবরে। নজরুল অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তাকে পুরস্কার দিয়েছে ১৬.৪ নম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কোর্স পদ্ধতিতে অনার্সে ৩২০০ নম্বরের মধ্যে নজরুল সাহিত্য পড়ানো হত মাত্র ৪৫ নম্বর। ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে সেমিস্টার পদ্ধতিতে মোট ৭৫ নম্বর পড়ানো হয়েছে। কিন্তু ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের নতুন সিলেবাসে ৩০০০ নম্বরের মধ্যে নজরুল সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১৬.৪ নম্বর। নজরুলের নামটা যে সিলেবাস থেকে উঠে যায়নি এটাই এখন সান্তনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম আলো পত্রিকাতে ২০১২ সালের ২৫মে সাংবাদিক হারুন-আল-রশীদ 'তিন হাজার নম্বরের মধ্যে নজরুলের জন্য মাত্র ১৬' শিরোনামে একটা প্রতিবেদন লেখেন। কিন্তু সিলেকশন কমিটির টনক নড়ানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিলনা। তার দোষ ছিল একটাই, তিনি সাম্যবাদী চেতনায় প্রচণ্ড রকম অসাম্প্রদায়িক হলেও ইসলামী চেতনার দীপ্ত সুধারস মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেননি। ফলে নজরুল রয়ে গেলেন বাঙালী সমাজে অবহেলিত। এখান থেকেই ফুটে উঠে আমাদের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তাদের আসল চেহারা। দরজার আড়ালে এই জ্ঞানপাপীরা নিজেরাই যে কি পরিমাণ নগ্ন সাম্প্রদায়িক, তার প্রমাণে দ্বিতীয় কোন উদাহরণের প্রয়োজন আছে কি?

বাংলা সাহিত্যে নজরুল :

নজরুল যেমন সমাজের বিষফোঁড়াসমূহে সুচ ঢুকিয়ে গুঁতা দিয়েছেন, তেমনি ইসলামী ভাবধারার মর্মমূলে জাতিকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন বারংবার। তাঁর অসংখ্য কবিতায় ইসলামী চেতনা ও ঐতিহ্যের ছাপ দৃশ্যমান। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলার আগে নজরুল মুসলিম জাতিকে দিয়েছেন অসংখ্য কবিতা, ইসলামী গযল, হামদ, নাত। যা দিশাহীন নাবিককে দেখিয়েছিল পথ, ভীরুর প্রাণে সঞ্চারিত করেছিল বাঁচার আশা, ঘুমন্ত মানুষকে দিয়েছিল জাগরণের চেতনা। তাইতো নজরুল আজ বাঙালী মুসলিম জাতির চেতনার উৎসে পরিণত হয়েছেন। 'জিঞ্জীর' কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'ঈদ মোবারক'

যেখানে নজরুল মুসলিম সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। ঈদ এমন এক উৎসব যেখানে মুসলিম জামাত সকল বাঁধা, শঠতা ভুলে গিয়ে এক কাতারে শামিল হয়। তিনি বলেন,

ইসলামে বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই।

বড়-ছোট, ধনী-গরীবের ব্যবধান ইসলাম কখনও মেনে নেয়না, বরং ছোট-বড়র মধ্যে এক চমৎকার সহাবস্থান সৃষ্টিতে ইসলাম বদ্ধপরিকর। নজরুল এ বিষয়টিকেই মূল লাইটহাউস ধরে তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম। তিনি বলেন,

আজি ইসলামী-ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাহি বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান ॥

ঈদ হল মুসলিম জাতির আত্মার মিলন, এই ঈদে ধনী গরীব সকলের আনন্দ করার অধিকার রয়েছে। ইসলাম শান্তির ডালি নিয়ে গরীব ধনী সকলের গৃহে আনন্দের প্লাবন বইয়ে দেয়। ধনী যেমন যাকাত দিবে, আর গরীব মুসলিম সেটা গ্রহণ করে সকলে মিলে আনন্দের স্রোতধারায় ভেসে যাবে। নজরুল যাকাতের ইঙ্গিত দিয়ে তাইতো বলেন,

বুক খালি ক'রে আপনারে সাজ দাও যাকাত,
ক'রো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত!

মুসলিমদের করুণ অবস্থা দেখে নজরুল মর্মাহত হয়েছিলেন প্রবলভাবে। একইভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন এক আমেরিকান নও-মুসলিম, তিনি বলেছিলেন, 'মেঘ যেমন সূর্যকে আড়াল করে রাখে, মুসলমানরাও তেমনি ইসলামকে আড়াল করে রেখেছে'। মুসলমানরা আজ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে, এখন তাদের লেজে-গোবরে অবস্থা। বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শকে একবার তাঁর এক খ্রিষ্টান বন্ধু বলেছিলেন যে, 'আপনি ইসলামের প্রতি যখন এতই অনুরক্ত তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন না কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি কিন্তু কোথায় সেই মুসলিম সমাজ যেখানে প্রকৃত মুসলমান হয়ে আমি বসবাস করতে পারব'? নজরুলও আক্ষেপ কম করেননি, তিনি বলেছিলেন–

'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু জ্ঞান'।।

মুসলমানদের মুনাফেকী চরিত্র দেখে নজরুল আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

"খালেদ!খালেদ! সবার অধম মরা হিন্দুস্তানী,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই,-না, না, ব'সে ব'সে শুধু
মুনাজাত ক'রি, চোখের সুমুখে নিরাশ সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নামাজ প'ড়িতে পারিনা, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবাগো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, "প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেউ নাই"।

মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে নজরুল গেয়েছেন,

'আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ; যাঁহার তারিফ জগৎময়।।
আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।।
আলাহু আকবর' ধ্বনি
আমার জিহাদ-বাণী।।

মুসলিম জাতি যুগের পর যুগ পরাধীন থেকেছে, শোষণের সহজ শিকার হয়েছে ব্রিটিশ বেনিয়াদের কাছে। আর নজরুল উৎসাহ জুগিয়েছেন এইসব পথভোলা মানুষদেরকে, জাতিসত্তা আর সাম্যের গান শুনিয়েছেন বারংবার। তাঁর ভাষায়-

'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম,
সত্য যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমীরে ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব এক সাথী।।
আমরা সেই সে জাতি'॥

ইসলামে নারীর মর্যাদা পুরুষের সমান, এটা নজরুলও প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়–

'নারীকে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতের বোরখা উতারি এনেছি আশার ভাতি-
আমরা সেই সে জাতি'।।

মুসলিম জাতি দিশা হারিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে চলেছে শুধুমাত্র নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে না জানার কারণে। অলস মুসলিম জাতির হীনমন্যতা, আন্তঃকলহ ও সঠিক আক্বীদা-আমল থেকে বিচ্যুত হয়ে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার অদ্ভুত মহড়া দেখে ব্যথিত কবি তাই লেখেন 'খালেদ' শিরোনামে এক বিশাল কবিতা। এই কবিতায় তিনি লিখেছেন,

তাওহীদের হায় এ চির সেবক + ভুলিয়া গিয়াছো সে তাকবীর
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায় + দরগায় গিয়া লুটাও শীর
ওদের যেমন রাম নারায়ণ + মোদের তেমন মানিক পীর
ওদের চাউল ও কলার সাথে + মিশিয়া গিয়াছে মোদের ক্ষীর
ওদের শিব ও শিবানির সাথে + আলী ফাতেমার মিতালী বেশ
হাসানরে করিয়াছি কার্তীক আর + হোসেনরে করিয়াছি গজ গনেশ
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে + আমরা তখনও বসে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি + ফেকা ও হাদিস চষে!
হানাফী ওহাবী লা-মজহাবীর + তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে + হাঁকিল 'তলপী তোল'!
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি + বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি + গরু ছাগলের মত!

নজরুল পবিত্র কালামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এর ফযীলতের কথা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন–

কালেমা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি।।
ঐ কলেমা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কলেমা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার সুখময় হয় তার-
মুসিবত আসে না কো, হয় না ক্ষতি।।

নজরুল ভীরু-কাপুরুষ হয়ে পড়া মুসলিম জাতির মাঝে কিভাবে সাহসের সঞ্চার করেছেন তা উপলব্ধি করা যায় তাঁর একটি গানের মধ্যে–

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায়-
আমি কি তায় ভয় করি
পাক্কা ঈমান-তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী।।
দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত,
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ-যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহশত-বন্দরেতে রে
এই যে কিশতীতে চড়ি।।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটা স্তম্ভ হল যাকাত। যাকাত ধনী ও গরীবের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ

করে। সমাজের মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যাকাত প্রদানের কোন বিকল্প নেই। আজ ধনী যদি তার যাকাত সময়মত পরিশোধ করত তাহলে মানুষের দরিদ্রতা অনেকাংশে কমে যেত। মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহ দিয়ে ইসলামী রেনেসাঁর কবি নজরুল বলেছেন–

দে জাকাত দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দিল্ খুলবে পরে, অরে আগে খুলুক হাত।।
দেখ পাক কোরআন, শোন নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান।
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত্।।
তোর দর-দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম,
আছে দৌলতের তোর তাদেরও ভাগ-বলেছেন রহীম।
বলেছেন রহমানুর রহীম, বলেছেন রসুলে করীম,

মুসলিম উম্মাহ্ আজ বিভিন্ন দল, মত, ইজম, মতবাদে ক্ষত-বিক্ষত। মুখে মুখে আল্লাহর আধিপত্য স্বীকার করলেও তারা ইসলামের রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে আজ। আজ মুসলিম জাতি রজ্জু ধরেছে আমেরিকার, রাশিয়ার, ব্রিটেনের, কেউ আবার রজ্জু ধরেছে তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা মানব রচিত বস্তাপঁচা গলিত মতবাদসমূহকে। ফলে তারা পরিণত হয়েছে এক দুর্দশাগ্রস্ত জাতিতে। তাই কবি দুঃখ করে বলেছেন–

জাগে না সে জোশ ল'য়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান।।
নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ঈমান,
নাহি আলীর জুলফিকর,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি বীর শহীদান।।
নাহি আর বাজুতে কুওত্,
নাহি খালেদ মুসা তারেক,
নাহি বাদশাহী তখত্ তাউস
ফকির আজ দুনিয়ার মালেক,
ইসলাম কেতাবে শুধু, মুসলিম গোরস্থান।।

আধুনিক মুসলিমদের নিস্পন্দন ধমনীতে ইসলামী শৌর্য-বীর্যের তপ্ত রক্ত প্রবাহের গতিবেগ সঞ্চারের মহান উদ্দেশ্যে এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানিয়ে নজরুল লিখেছেন–

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওত্ এসেছে নয়া জমানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান।।
মুখেতে কলেমা, হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া ইশক্ আল্লার
চল্ আগে চল্ বাজে বিষাণ।

আবার তিনি বলেছেন–

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর
মগরেবের আজ শুনি আজান।
জামাত্ শামিল হও রে এশা-তে
এখনো জামাতে আছে স্থান।।

মুসলিম জাতি আজ ঘুমিয়ে আছে সুপ্ত পুষ্প কুঁড়ির মত। এখন সময় তার জেগে ওঠার। প্রবল ইচ্ছাশক্তির টানে নজরুল আহবান জানিয়েছেন পিছিয়ে পড়া শেষের বেঞ্চের মুসলিমদেরকে। তিনি বলেন–

আনো আলীর শৌর্য, হোসেনের ত্যাগ,
ওমরের মতো কর্মানুরাগ,
খালেদের মতো সব অসাম্য
ভেঙে করো একাকার।।
ইসলামে নাই ছোট বড় আর
আশরাফ আতরাফ,
এই ভেদ জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করো মিসমার সাফ।
চাকর সৃজিতে চাকুরী করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে?
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন-
এ জুলুম সহে নি ক ইসলাম,
সহিবে না আজও আর।।

স্বজাতির প্রতি খেদোক্তি করার সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা সমালোচনার ঝড় তোলে তাদের বিরুদ্ধেও তিনি কামান দাগতে ভুলেননি। 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' কবিতায় তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে–

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অবেদ।
উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদী দর্জা চাই;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!
ওরা মরিবেনা, যুদ্ধ বাঁধিলে ওরা লুকাইবে কচুবনে,
দন্ত নখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে ।

ওরা নির্জীব জীব নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা জিন, প্রেত, যজ্ঞ, উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে ।
মোরা বাংলার নব যৌবন, মৃত্যুর সাথে সঞ্চরী,
উহাদের ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি না ক তাই দয়া করি।

মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানী-চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি ।
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লাহ মানুষে জানাজানি।

উহারা চাহুক অশান্তি; মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুলবাহার!
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্তি হেরি মানব
ফিরিবে ভোগের পথ ভয়ে, চাহিবে শান্তি কাম্য সব।

হুতুম প্যাঁচারা কহিছে কোটরে, হইবেনা আর সূর্যোদয়,
কাকে আর টাকে ঠোকরাইবেনা, হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলেনা এ কথা, তারা আলো চাই, চাহে জ্যোতি;
তারা চাহে না ক এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।

দাঙ্গা বাঁধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী , তারা গুন্ডাদল
তার দেখিবেনা আল্লাহর পথ চিরনির্ভয় সুনির্মল ।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায়!

নিত্য সজীব যৌবন যার, এস এস সেই নৌ-জোয়ান
সর্বক্লৈব্য করিয়েছে দূর তোমাদেরই চির আত্মদান !
ওরা কাঁদা ছুড়ে বাধা দেবে ভাবে-ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুড়ে মারিব ওদের, বলিব– "আল্লাহ জিন্দাবাদ"

অনুরূপভাবে মৌলভী তরিকুল আলম কাগজে এক প্রবন্ধ লিখে বললেন কুরবানীতে অকারণে পশু হত্যা করা হয়, এমন ভয়াবহ রক্তপাতের কোন মানে নাই। নজরুল তার জওয়াবে লিখলেন 'কোরবানী' কবিতা। তাতে তিনি বললেন-

ওরে, হত্যা নয়, এ সত্যগ্রহ শক্তির উদ্বোধন,
দুর্বল ভীরু চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন।
-এই দিনই মীনা ময়দানে
-পুত্র স্নেহের গর্দানে
-ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ,
ছি,ছি, কেঁপো না ক্ষুদ্র মন।

এভাবে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমল-আক্বীদা, শৌর্য-বীর্য নিয়ে অত্যন্ত শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। পরিশেষে এখানে আমরা একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখব নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কতগুলো ইসলাম কি কি বিষয়ক লেখা লিখেছেন–

-'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাটি ছিল 'শাত-ইল আরব' (মে,১৯২০)।
-২য় কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' (জুলাই ১৯২০)।
-'কোরবানী' ছাপা হয় ১৩২৭-এর ভাদ্রে (আগস্ট, ১৯২০)।
-'মহরম' ছাপা হয় ১৩২৭-এর আশ্বিনে (সেপ্টেম্বর ১৯২০)।
-১৯২২-এর অক্টোবরে নজরুলের যে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য প্রকাশিত হয় তার ১২টি কবিতার মধ্যে 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তস্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু' এই পাঁচটি কবিতা বাদ দিলে দেখা যায় বাকি ৭টি কবিতাই মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কিত (১৯২২)।
-আরবী ছন্দের কবিতা (১৯২৩)।
-১৯২৪-এ প্রকাশিত তাঁর 'বিষের বাঁশীর প্রথম কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' (আবির্ভাব-তিরোভাব) (১৯২৪)
-'খালেদ' কবিতা (১৯২৬)
-'উমর ফারুক' কবিতা সওগাতে প্রকাশিত (১৯২৭)
-'জিঞ্জির' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ (১৯২৮)
-'রুবাইয়াত ই হাফিজ প্রকাশ (১৯৩০)
-কাব্য আমপারা (১৯৩৩)
-'জুলফিকার' ইসলামিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ (১৯৩২)
-'মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা' ও 'যাবি কে মদিনায়' নাত এ রসুল প্রকাশ (১৯৩৩)
-'তওফীক দাও খোদা' ইসলামী নাত-এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৩৪)
-মক্তব সাহিত্য প্রকাশ (১৯৩৫)
-ফরিদপুর যেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে 'বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও' অভিভাষণ পাঠ (১৯৩৬)
-'সেই রবিউল আউয়ালের চাঁদ' নাত-এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৩৭)
-'ওরে ও মদিনা বলতে পারিস' নাত এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৩৮)
-'দীওয়ান-ই-হাফিজ'-এর ৯টি গজল অনুবাদ এবং নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (১৯৩৯)
-নতুন চাঁদ (১৯৩৯)
-'খোদার রহম চাহ যদি নবিজীরে ধর' নাত-এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৪০)
-'মরুভাস্কর' (অসুস্থ হবার পরে প্রকাশিত ১৯৫০)
-'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৫৮)

কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান :

১. নজরুল বাংলা ভাষায় সর্বাধিক 'হামদ-নাত'-এর রচয়িতা।
২. গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে নজরুলের হামদ-নাত যখন বের হতো, তখন মাঝে মাঝে রেকর্ডের ওপর 'পীর-কবি নজরুল' লেখা থাকত।
৩. বাংলা ভাষায় যারা হামদ-নাত রচনা করে গেছেন, তাদের মধ্যে একই সাথে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম উভয় বিষয়ে পারদর্শী কেউ ছিলনা, একমাত্র ব্যতিক্রম নজরুল।
৪. একাধিক আরবী-ছন্দ নিয়ে নজরুলের অসংখ্য কবিতা আছে, বাংলা ভাষার আরও এক প্রতিভাবান কবি ফররুখ আহমদ এ বিষয়ে কারিশমা দেখাতে পারেননি।
৫. ইরানের কবি হাফিজ আর ওমর খৈয়ামের যতজন 'কবি' অনুবাদক আছেন তার মধ্যে নজরুল একমাত্র মূল ফারসী থেকে অনুবাদ করেছেন, বাকী সবাই ইংরেজী থেকে।
৬. 'ফারসী' এবং 'আরবী'তে নজরুল-এর জ্ঞান ছিল পাণ্ডিত্যের পর্যায়ে।
৭। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে 'ইসলামি গান' নজরুলের পূর্বে আর কেউ গায়নি।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম (১৯২০-১৯৪১) থেকে শেষ পর্যন্ত নজরুল অজস্র ধারায় ইসলাম বিষয়ক লেখা লিখে গিয়েছেন উপরের পরিসংখ্যান সেটাই প্রমাণ করে।

পরিশেষে এতটুকুই বলা যায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমনভাবে অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ আর বিদ্রোহের জন্য বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়পটে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি ইসলামের বিজয়ডঙ্কা উচ্চারণে তাঁর বলিষ্ঠ শব্দস্রোত মুসলিম সমাজকে আন্দোলিত করেছে। প্রথম জীবনে ধর্মের সাথে তেমন সম্পর্ক না থাকলেও শেষ জীবনে তিনি ধর্মের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। এ কথা সত্য যে তৎকালীন ছূফীবাদী পরিবেশ এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাযারো কুসংস্কার তাঁর সাহিত্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছূফীবাদী দর্শন ও শিরকী প্রভাব যুক্ত করেছে। তবে এর দায় তার নয়, বরং তৎকালীন মুশরিক ও বিদআতী ধর্মনেতারা। বলা বাহুল্য, সারাজীবন অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে গেলেও নজরুলের শেষ জীবনের ধর্মানুরাগ তাকে পরবর্তীকালের তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবিদের কাছে বিরাগভাজন ও অপাঙক্তেয় করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ 'জাতীয় কবি' হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান না, যেমনটি পেয়ে এসেছেন কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার প্রতি এই অবহেলার একমাত্র কারণ তিনি অসাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রচারক হওয়ার সাথে সাথে আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি, ইসলামী চেতনা ও আদর্শকে তিনি পুরোপুরিভাবে বিসর্জন দিতে পারেন নি।

গ্রন্থপঞ্জী :

ক. নজরুল রচনাবলী-অষ্টম খণ্ড।
খ. নজরুলের পত্রাবলী।
গ. ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত/সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ।
ঘ. নজরুলঃ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এবং শিল্পীর বোধ/ সৌমিত্র শেখর
ঙ. উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, নিবন্ধমালা, পঞ্চদশ খণ্ড, ২০০৯।
চ. নজরুলের ইসলামী সঙ্গিত ও কবিতায় অনৈসলামী আক্বীদা, আব্দুল হামীদ ফায়যী, ২০০৮।

[লেখক: মাস্টার্স, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

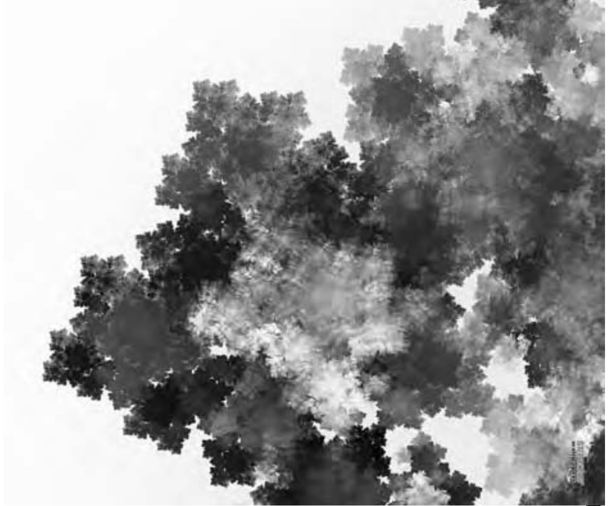
কবিতা

আমি গাহি তারি গান

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি গাহি তারি গান----
দৃপ্ত-দম্ভের রে-যৌবন আজি ধরি অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙ্গার ইতিহাস-লেখ! যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে!
যারা ভেঙ্গে চলে অপ-দেবতার মন্দির আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়ি-খানা।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।
মিথ্যা মোহের পূজা-মন্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মম---মোহ মুদ্গার ভাঙ্গেনের গদা লয়ে।
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে,
দু'হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল! গোরস্থানে চষে
ছুঁড়ে ফেলে যত সব কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।
গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।---
--- সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কুলে। সেই দুরন্ত লাগি
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।
ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের দূর-সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা-সতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী!
সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগ, তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পানির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি,
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্কারী!
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী---
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম তাহাদের গান গাহি!
গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাকে নিখিল ব্যেপে---
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুঁটি ঐ হাসে!

গাহি তাহাদের গান----
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণীর নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফুলে!
বন্য-শ্বাপদ-শঙ্কুল জরা মৃত্যু ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা!
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র মরুর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে!
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর শিশু
তারাই গাহিল নব প্রেম গান ধরণী-মেরীর যিশু
যাহাদের চলে লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে!
খেয়াল-খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয় গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর!
নবীন জগত সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়ে উড়িয়া চলেছে যাহারা উর্ধ্ব পানে!
তবুও থামে না যৌবন-বেগ জীবনের উলস্নাসে
চলেছে চন্দ্র মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছি ফিরি, ভীম রণবুমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মোর-কবি-গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুন উগ্রসুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে।
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব সম কোন বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পড়িল ক্ষুদ্রমনে,
কূপ-মন্ডুক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই বন্দনা করি তারে!
---০০---



সংগঠন সংবাদ

যেলা সংবাদ

ছাত্র সংবর্ধনা

বংশাল, ঢাকা ১৪ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার যেলা কার্যালয় অডিটরিয়ামে এক ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, 'আন্দোলন'-এর যশোর যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারুক, 'আন্দোলন'-এর সদর উপযেলার সভাপতি আব্দুল খালেক, সহ-সভাপতি ও মাহমুদপুর সীমান্ত আদর্শ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক মহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, অর্থ সম্পাদক আব্দুল মালেক, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনমণি'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল মালেক, যশোর যেলা যুবসংঘের সভাপতি ও সোনামণির পরিচালক আশরাফুল ইসলাম সহ যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের কর্ম পরিষদবৃন্দ ও সোনামণির যেলা ও উপযেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ।

ইসলামিক সেন্টার বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বা'দ আছর দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত **'সোনামণি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৩'** অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'সোনমণি'-এর পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুর বাছীর, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার, 'সোনামণি'-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর যেলা প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুর মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি ও 'সোনামণি'র উপদেষ্টা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, 'দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া কমপ্লেক্স'-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ওবাইদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা পরিচালক হাফীযুর রহমান, সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, সাইদুর রহমান, ইসরাঈল হোসেন, মুছত্বফা মাহমুদ, রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুসলিম, রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আতাউল্লাহ, যেলার আশাশুনি উপযেলার পরিচালক শফিউল আলম, কলারোয়া উপযেলার পরিচালক আব্দুর রহীম, তালা উপযেলার পরিচালক আবু রায়হান, সাতক্ষীরা সদর উপযেলা পরিচালক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম সহ যেলা ও উপযেলা আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণির বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারুক। পরিশেষে হাফীযুর রহমানকে পরিচালক ও অলীউর রহমান, সাইদুর রহমান, মুছত্বফা মাহমুদ এবং আব্দুর রহীমকে সহ-পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি সাতক্ষীরা পরিচালনা পরিষদ' ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য পুনর্গঠন করা হয়।

ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

মোহনপুর, রাজশাহী ১৪ জুলাই রবিবার : অদ্য বা'দ আছর 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত মোহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী (উত্তর) সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ১৫ জুলাই সোমবার : অদ্য বিকাল ৪টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর এ্যামিরেটারস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর প্রফেসর ড. যহুরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, রাবি 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মেছবাহুল ইসলাম, সহ-সভপতি ছাদিক মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাবি 'যুবসংঘ'-এর সেন্ট্রাল কমিটি ও অনুষদ ভিত্তিক শাখার অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল মান্নান। উল্লেখ্য যে, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এটিই প্রথম কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া অনুষ্ঠান।

সৈয়দপুর, নীলফামারী ৩১ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সৈয়দপুর থানাধীন শ্বাসকান্দর চেংমারীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবর হোসাইন ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। উল্লেখ্য, সংগঠনের উদ্যোগে উক্ত মসজিদে এটিই প্রথম অনুষ্ঠান। এতে উক্ত এলাকার আহলেহাদীছ জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। এখানে মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুজাহীদকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘে'র ৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

তাহেরপুর, রাজশাহী ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন তাহেরপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. মানছূর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, তাহেরপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয খোরশেদ আলম প্রমুখ।

শিবগঞ্জ, বগুড়া ৩০ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন নান্দুরা ঈদগাহ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন ও আটমুল দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আমীনুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুবকর, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, প্রচার সম্বপাদক হাবীবুর রহমান, শিবগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওবাইদুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রুহেল প্রমুখ।

দিনাজপুর-পশ্চিম ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিরল থানাধীন নবনির্মিত বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবর হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল করীম, উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয শফীকুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তোফাযযল হোসাইন, দফতর সম্পাদক রাশেদুল আলম ও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ ওছমান গণী।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আশীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর বংশালস্থ 'যুবসংঘ'-এর ঢাকা যেলা কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ অহীদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারুণুর রশীদ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কাবীর ও ঢাবি 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মেহেদী আরীফ।

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯ জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়'? এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং অন্যের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান।

রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আশীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মেছবাহুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আববাস, 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার সভাপতি হাফেয আসীফ রেযা, ভূগরইল শাখা সভাপতি রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

বটতলী, জয়পুরহাট ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে বটতলী বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তোফায়েল আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আমীনুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মোনায়েম হোসাইন প্রমুখ।

শাখা সংবাদ

সন্তোষপুর (পূর্বপাড়া), রাজশাহী ১২ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বা'দ জুম'আ সন্তোষপুর (পূর্বপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর শাখা পুর্নগঠন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহনাগরীর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র শাখার দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ। পরিশেষে মকবুল হোসাইনকে সভাপতি ও শামীম রেযাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট সন্তোষপুর শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

বালিয়াডাঙ্গা, পবা, রাজশাহী ১২ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বা'দ আছর বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা গঠন ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহনাগরীর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক মামুনুর রশীদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। পরিশেষে মাকবুল হোসেন মুকুলকে সভাপতি ও ওয়াসিম আকরামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বালিয়াডাঙ্গা শাখা গঠন করা হয়।

পলিটেকনিক কলেজ, রাজশাহী ১৫ জুলাই সোমবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১১টায় পলিটেকনিক কলেজ মসজিদে কলেজ শাখা গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহনাগরীর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। পরিশেষে ম্যাকানিক্যাল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ ইসরাফিলকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাশিম রেযাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী পলিটেকনিক কলেজ শাখা গঠন করা হয়।



সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

মিসর : সেনা অভ্যুত্থান ও মুরসির বিদায়

আফ্রিকা তথা আরব বিশ্বের অন্যতম দেশ মিসরকে বলা হয় 'নীল নদের দান'। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, বর্তমানে এই নীলনদ পরিণত হয়েছে অসহায় মানুষের মৃত্যুপুরীতে। গত ৩ জুলাই ২০১৩ মিসরের ইতিহাসের সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসী এক বছরের মাথায় ধর্মনিরপেক্ষ আর উদারপন্থীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং কার্যত বন্দী হন। এরপর মুরসির দল 'মুসলিম ব্রাদারহুড'-এর সমর্থকবাহিনী রাস্তায় নেমে আসেন। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে স্মরণকালের ভয়ংকর সংঘাত ও সহিংসতা। দেশ এক গভীর সংকটের মুখে নিমজ্জিত হয়। মিসরবাসী হয়ে পড়ে দ্বিধা-বিভক্ত ও অভিভাবকশূন্য। লেলিয়ে দেওয়া হয় 'মিসরের নব্য ফারাও' হিসাবে পরিচিত আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সৈন্যবাহিনী। চালানো হয় গণহত্যা। শত শত মানুষের মৃত্যুতে মিসর রক্তাক্ত ইতিহাসের এক রক্তস্রোত নদীতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হল, যে তাহরীর স্কয়ারে মিসরবাসী মুরসির সমর্থনে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মাত্র এক বছরের মাথায় এমন কি ঘটল যে ঐ একই স্থানে তার বিরুদ্ধে পুনরায় বিক্ষোভ শুরু হল। এর জবাব হল, তিনি মার্কিন মোড়ল বারাক ওবামার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেননি। সেনাপ্রধান তানতাবীকে পদচ্যুত করার পর মুরসি তার ঘনিষ্ট সেনাকর্মকর্তা আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে মিসরের সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেই সিসিই পরবর্তীতে মুরসি বিরোধী আন্দোলনের সময় ২ জুলাই সংকট নিরসনে বিক্ষোভকারীদের পাশাপাশি সরকারকে ৪৮ ঘন্টা সময় বেঁধে দেন। অতঃপর ৩ জুলাই তিনি ক্ষমতা দখল করেন। পাশাপাশি ২৬ জুলাই ফিলিস্তীনের কট্টোরপন্থী সংগঠন হামাসের সাথে যোগাযোগের অভিযোগে মুরসিকে ১৫ দিনের আটকাদেশ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা মুরসির ছন্দপতন হল। আর মিসরে পুনরায় গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটল।

পাকিস্তানে মামনুন হুসাইন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন দল (পিএমএলএন)-এর প্রার্থী মামনুন হুসাইন (৭৩) দেশটির ১২তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৩০ জুলাই মঙ্গলবার জাতীয় ও প্রাদেশিক এমপিদের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সেপ্টেম্বরে মেয়াদ শেষে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি।

প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কের জের ধরে এই নির্বাচন বয়কট করেছিল। তারা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন ও তৃতীয় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত সাবেক ক্রিকেটার ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি ওয়াজিউদ্দীন আহমাদকে প্রার্থী দিয়েছিল। তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট পান। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসাইন ৯ সেপ্টেম্বর শপথ বাক্য পাঠ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফখরুদ্দীন জি ইবরাহীম জানান, পিএমএল-এন সমর্থিত প্রার্থী মামনুন হুসাইন পার্লামেন্টের দুই কক্ষ ও চারটি প্রাদেশিক পরিষদ মিলিয়ে মোট ৪৩২ টি ভোট পেয়েছেন। যদিও তার জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৬৩ টি ভোট। আবার এর মধ্যে তিনি জাতীয় পরিষদ ও সিনেট মিলিয়েই ২৭৭ টি ভোট পেয়ে জয়লাভ নিশ্চিত করেন। নির্বাচনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রার্থী বিচারপতি ওয়াজিদ্দীন আহমাদ মোট ভোট পেয়েছেন ৭৭ টি। আর ভোট বাতিল হয় মোট ৯টি। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতি সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের মাধ্যমে। এতে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ সিনেট ও নিম্ন কক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এবং চারটি প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা বিবেচনায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেক্টোরালের সর্বমোট সংখ্যা ১১৭০টি। আর ভোটের সংখ্যা ৭০৬ টি। অন্যদিকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর হত্যা মামলায় সাবেক সেনাশাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে অভিযুক্ত করেছে দেশটির আদালত।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরীর ফিলিস্তীনে আগমন

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি গত ২৯ জুলাই সোমবার ফিলিস্তীন ও ইসরাইলের মধ্যকার বিরাজমান সংকটে শান্তি স্থাপনের জন্য ফিলিস্তীনে গমন করেন। সেখানে তিনি ফিলিস্তীন ও ইসরাইলের মধ্যকার তিন বছর পর ওয়াশিংটন কর্তৃক প্রথম এই শান্তি আলোচনা শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র এই শান্তিচুক্তিতে উপনীত হতে বড় ধরনের ছাড় দিতে দুই পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরীর সাথে গত ২৯ জুলাই সোমবার এক সন্ধ্যায় এক ভোজসভায় মিলিত হন। এ সময় ফিলিস্তীনের প্রধান আলোচক সায়েব ইরাকাত ও ইসরাঈলের প্রধান আলোচক জিপি লিভনি কেরীর বিপরীত দিকে পাশাপাশি বসেন। সেখানে তারা একত্রে ইফতার করেন। কেরী তাদের স্বাগত জানিয়ে ওই মুহূর্তটিকে 'অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ' বলে বর্ণনা করেন।

কেরী দুই পক্ষের মধ্যকার অচলাবস্থা ভাঙ্গতে ওই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রসিকতা করে বলেন, 'আসলে এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলার নেই'। তার এ মন্তব্যে অনেকে মনে করেছেন যে, এর মধ্যে দিয়ে শান্তি আলোচনার অচলাবস্থা অবসানের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাফল্য অর্জিত হতে পারে। কেরী সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের সাথে ত্রিমুখি বৈঠক করেন। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শান্তি আলোচনা শুরুকে স্বাগত জানিয়ে একে সামনে এগিয়ে নিতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তবে তিনি সতর্ক করে দেন যে, এ বিষয়ে তাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ত্রাস সৃষ্টিকারী প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের নিরব বিদায়
হাসান রূহানী ইরানের সপ্তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

২০১৩ সালের জুনের ১৪ তারিখে ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের ১১তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর উক্ত নির্বাচনে ইরানের সপ্তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে হাসান রূহানী গত ৩ আগষ্ট সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল-খামেনীর মাধ্যমে সাবেক কার্পেটে ঘুমানো প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের স্থলাভিষিক্ত হলেন। আর এরই মাধ্যমে ইরানের পরপর দুই মেয়াদে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের নিরব বিদায় হল। গত ৪ আগষ্ট ২০১৩ হাসান রূহানী পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেওয়ার পরপরই ১৮ সদস্যের মন্ত্রীপরিষদের নাম প্রস্তাব করেন তিনি। অবশেষে ১৫ আগষ্টে পার্লামেন্ট রূহানী প্রস্তাবিত ১৮ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীপরিষদের মধ্য থেকে ১৫ জনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করে।

অন্যদিকে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতাকালীন সময়ে অত্যন্ত সাহসী ও সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তিনি দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। প্রেসিডেন্ট অফিসে সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল-সন্ধ্যা সাধারণ ইরানীদের চিঠি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল তিনি তার ভবনকে সর্বসাধারণের জন্য সর্বদা উম্মুক্ত করে দেন। তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আঙ্গুলী ইশারায় বক্তব্য দিতেন। এরই জন্য তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একজন ত্রাসসৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : মানবজাতির আগমনের পূর্বেই কোন মসজিদের আবির্ভাব ঘঠেছিল?
উত্তর : কা'বা শরীফ।
২. প্রশ্ন : পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গৃহের নাম কি?
উত্তর : বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফ।
৩. প্রশ্ন : বিশ্ব মুসলিমের কেবলা কোন মসজিদ?
উত্তর : মসজিদুল হারাম।
৪. প্রশ্ন : কার নির্দেশে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল?
উত্তর : আল্লাহ্‌র নির্দেশে।
৫. প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কারা এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন?
উত্তর : ফেরেশতাগণ।
৬. প্রশ্ন : সর্বপ্রথম মানুষের জন্য নির্ধারিত গৃহের নাম কি?
উত্তর : বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফ।
৭. প্রশ্ন : এই গৃহ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বাক্কায় বা মক্কায়।
৮. প্রশ্ন : সারাবিশ্বের মানুষের জন্য হেদায়াত ও বরকতময় গৃহ কোনটি?
উত্তর : বায়তুল্লাহ।
৯. প্রশ্ন : কা'বাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয় কোন সময়ে?
উত্তর : নূহের প্লাবনের সময়ে।
১০. প্রশ্ন : কার নির্দেশে কা'বাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়?
উত্তর : আল্লাহ্‌র নির্দেশে।
১১. প্রশ্ন : বায়তুল্লাহ শরীফে মানুষ কখন থেকে হজ্জে গমন করে আসছে?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-এর সময় থেকে।
১২. প্রশ্ন : বিশুদ্ধ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক কা'বা গৃহ এ পর্যন্ত কতবার নির্মিত হয়েছে?
উত্তর : ১২ বার।
১৩. প্রশ্ন : কা'বা গৃহ দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন কে?
উত্তর : আদম (আঃ)।
১৪. প্রশ্ন : কা'বা গৃহ তৃতীয়বার নির্মাণ করেন কে?
উত্তর : হযরত শীছ (আঃ)।
১৫. প্রশ্ন : গৃহটি চতুর্থবার কারা ও কার নির্দেশে নিমার্ণ করেন?
উত্তর : ইবরাহীম ও স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ); আল্লাহ্‌র নির্দেশে।
১৬. প্রশ্ন : পঞ্চমবারে কারা এই গৃহ নির্মাণকাজ করেন?
উত্তর : আমালেকা জাতি।
১৭. প্রশ্ন : ষষ্ঠবারের মত নির্মাণ করেন কারা?
উত্তর : জুরহাম জাতি।
১৮. প্রশ্ন : কা'বা গৃহ সপ্তমবারের মত পুনঃনির্মাণ করেন কোন ব্যক্তি?
উত্তর : কুসাই বিন ক্বিলাব।
১৯. প্রশ্ন : অষ্টমবারে পুনঃনির্মাণ করেন কারা?
উত্তর : কুরাইশ গোত্র।
২০. প্রশ্ন : নবম ও দশমবারে এই গৃহটি পুননির্মাণ করেন কে কে এবং কোন সালে?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) (৬৫ হিঃ) ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৪ হিঃ)।
২১. প্রশ্ন : কত সালে একাদশবারে কে পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : ১০৪০ হিঃ, সুলতাল মুরাদ তুর্কী।
২২. প্রশ্ন : কত সালে দ্বাদশবারে কে পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : ১৪১৭ হিঃ, বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয।
২৩. প্রশ্ন : কুরাইশরা কেন কা'বাঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিলেন?
উত্তর : মক্কায় এক ভয়াবহ বন্যায় কা'বাঘর বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে।
২৪. প্রশ্ন : মক্কায় কোন সময়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ বছর পূর্বে।
২৫. প্রশ্ন : কোন বাদশাহ কা'বাঘর ধ্বংসের অভিপ্রায় নিয়ে আগমন করে?
উত্তর : বাদশাহ আবরাহা।
২৬. প্রশ্ন : বাদশাহ আবরাহা কোন জিনিস নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে আসে?
উত্তর : বিরাটাকায় হস্তীবাহিনী নিয়ে।
২৭. প্রশ্ন : হিজরতের কত বছর পূর্বে কা'বাঘর বন্যায় বিধ্বস্ত হয়?
উত্তর : ১৮ বছর পূর্বে।
২৮. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত বায়তুল্লাহ্‌র ভিত সর্বপ্রথম কারা হ্রাস করে নির্মাণ করেন?
উত্তর : কুরাইশরা।
২৯. প্রশ্ন : বায়তুল্লাহ্‌র ভিত কোনদিকের কতটুকু হ্রাস করা হয়েছিল?
উত্তর : উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৩ মিটার।
৩০. প্রশ্ন : কুরাইশরা বায়তুল্লাহ্‌র হ্রাস কেন করেছিলেন?
উত্তর : এ গৃহ নির্মাণে কোন হারাম বা অবৈধ অর্থ ব্যয় না করার সিদ্ধান্তে আর্থিক ঘাটতি হওয়ার কারণে।
৩১. প্রশ্ন : বায়তুল্লাহ শরীফের প্রথম ছাদ কারা নির্মাণ করেন?
উত্তর : কুরাইশরা।
৩২. প্রশ্ন : কা'বার দরজা মাতাফ থেকে বেশ উপরে স্থাপনের কারণ কি?
উত্তর : যাতে ইচ্ছামত কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।
৩৩. প্রশ্ন : বায়তুল্লাহ্‌র কোন পুনঃনির্মাণে মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন?
উত্তর : অষ্টমবারে কুরাইশ গোত্র কর্তৃক পুনঃনির্মাণ কাজে।
৩৪. প্রশ্ন : হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন করা সংক্রান্ত বিবাদ-কলহ কোন সময়ে ঘঠে?
উত্তর : অষ্টমবারে কুরাইশ গোত্র কর্তৃক পুনঃনির্মাণ কাজে।
৩৫. প্রশ্নর : হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন করা সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ কে বিচক্ষণতার সাথে মিমাংসা করেন?
উত্তর : বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।
৩৬. প্রশ্ন : কে ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন?
উত্তর : বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।
৩৭. প্রশ্ন : বায়তুল্লাহ শরীফের ইবরাহীমী ভিত্তির স্বরূপ কেমন ছিল?
উত্তর : পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি দরজা ছিল।
৩৮. প্রশ্ন : ইবরাহীমী ভিত্তির উপর কে কত সালে বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইব (রাঃ), ৬৫ হিজরীতে।
৩৯. প্রশ্ন : উমাইয়া শাসক আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান মক্কার গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর সাথে কখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তা কতদিন স্থায়ী হয়?
উত্তর : ৭৩ হিজরীতে এবং একমাস।
৪০. প্রশ্ন : হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কেন কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেন?
উত্তর : উমাইয়া শাসক আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান ও মক্কার গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধে কা'বাঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : দেশের প্রথম 'যেলা বাজেট' পায় কোন যেলা এবং কত?
উত্তর : টাঙ্গাইল; ১,৬৭৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।
২. প্রশ্ন : বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট কততম অর্থ বাজেট?
উত্তর : ৪৩তম ।
৩. প্রশ্ন : ডর্নিয়ার ২২৮ এনজি কি?
উত্তর : বাংলাদেশের নৌবাহিনীতে প্রথমবারের মত সংযুক্ত সমুদ্র টহল বিমান।
৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুসারে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ৯২৩ মার্কিন ডলার।
৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুসারে দেশে সাক্ষরতার হার কত?
উত্তর : ৫৭.৯%।
৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?
উত্তর : ৭৩টি।
৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ স্পীকার কে?
উত্তর : ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
৮. প্রশ্ন : স্পীকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান কে?
উত্তর : রাষ্ট্রপতি।
৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে তৈরী দ্বিতীয় যুদ্ধজাহাজের নাম কি?
উত্তর : বানৌজা সুরমা।
১০. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন ব্যাংক প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে?
উত্তর : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।
১১. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে মোট কতটি উপযেলা রয়েছে?
উত্তর : ৪৮৭ টি।
১২. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে মোট পৌরসভা কতটি?
উত্তর : ৩১৭ টি।
১৩. প্রশ্ন : 'তরুয়া' সমুদ্র সৈকত কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভোলা।
১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কতজন ব্যক্তি এভারেষ্ট জয় করেছেন?
উত্তর : ৫ জন।
১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম ইট দিয়ে নির্মিত প্রাচীন জলাধরের সন্ধান কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তর : দিনাজপুর যেলার ঘোড়াঘাট উপযেলার গোপালপুর গ্রামে।
১৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশে কয় ধরনের মহিষ রয়েছে ও কি কি?
উত্তর : দু' ধরনের। যথা (১) রিভারাইন (২) জলাভূমি।
১৭. প্রশ্ন : প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বর্তমানে কতটি মহিষ রয়েছে?
উত্তর : প্রায় সোয়া ১৪ লাখ।
১৮. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে প্রচলিত আইনের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১০৫৬ টি।
১৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাথে কোন দেশের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বিনিময় চুক্তি রয়েছে?
উত্তর : ভারতের সাথে।
২০. প্রশ্ন : 'বিএনএস সমুদ্র জয়' কি?
উত্তর : বাংলাদেশ নৌহবাহিনীর বৃহত্তম জাহাজ।
২১. প্রশ্ন : ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের আকার কত?
উত্তর : ২,২২, ৪৯১ কোটি টাকা।
২২. বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশের কতজন শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন?
উত্তর : ১১২ জন।
২৩. বাংলাদেশে সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম কি?
উত্তর : বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল)।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : আইপড কি?
উত্তর : অ্যাপলের বহনযোগ্য গান শোনার যন্ত্র।
২. প্রশ্ন : এলসিডি (Liquid Crystal Display-LCD)-এর জনক কে?
উত্তর : সুইস পদার্থবিদ মার্টিন সাউট।
৩. প্রশ্ন : বৈদ্যুতিক পাখার জনক কে?
উত্তর : স্কাইলার হুইলার (১৮৮২ সালে)।
৪. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশের লোক সবচেয়ে বেশী শরণার্থী হয়েছে?
উত্তর : আফগানিস্তান।
৫. প্রশ্ন : শরণার্থী আশ্রয় দেওয়া শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : পাকিস্তান।
৬. প্রশ্ন : 'তাকসিম স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : তুরস্ক।
৭. প্রশ্ন : মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর স্যংখ্যায় বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
৮. প্রশ্ন : বিশ্বে শিশু মৃত্যুহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সিয়েরা লিওন।
৯. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক পরমাণু অস্ত্র রয়েছে?
উত্তর : রাশিয়া।
১০. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বের দ্রুতগতির সুপার কম্পিউটারের নাম কি?
উত্তর : তিয়ানহে-২ (চীন)।
১১. প্রশ্ন : সর্বাধিক বিশ্ব ঐতিহ্য রয়েছে কোন দেশে এবং কতটি?
উত্তর : ইতালিতে; ৪৯ টি ।
১২. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর কোনটি?
উত্তর : অসলো (নরওয়ে)।
১৩. প্রশ্ন : হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীদের জন্য মদীনায় কতটুকু এলাকা জুড়ে এবং কোন রোডের উপর আলাদা শহর নির্মাণ করা হবে?
উত্তর : ১.৬ মিলিয়ন বর্গমিটার এলাকাজুড়ে, হিজরাহ রোডের উপর।
১৪. প্রশ্ন : সর্বাধিক শ্বেতমর্মরের শহর কোনটি?
উত্তর : তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদ।
১৫. প্রশ্ন : তুর্কী বসন্তের সূচনাকাল কত?
উত্তর : ৩১শে মে ২০১৩।
১৬. প্রশ্ন : টেলিগ্রামের জন্ম কবে?
উত্তর : উনিশ শতকের মাঝামাঝি।
১৭. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম কবে, কোথা থেকে কোথায় এবং কার টেলিগ্রাম পৌঁছেছিল ?
উত্তর : ১৮৪৪ সালের ২৬ মে; ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর; শ্যামুয়েল মোর্সর।
১৮. প্রশ্ন : ভারত সরকার কবে টেলিগ্রাম-পরিসেবা বন্ধ ঘোষণা করে এবং কবে শেষ টেলিগ্রাম পাঠায়?
উত্তর : বন্ধ : ১৫ জুলাই ২০১৩; প্রেরিত শেষ টেলিগ্রাম : ১৪ জুলাই ২০১৩।
১৯. প্রশ্ন : ভারতে নতুন করে চালু হওয়া টেলিগ্রাম পরিসেবার নাম কি?
উত্তর : ওয়েব বেসড টেলিগ্রাম সার্ভিস (WTS)।
২০. প্রশ্ন : পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্টের নাম কি?
উত্তর : মিয়া মুহাম্মাদ নওয়াজ শরীফ।
২১. পাকিস্তানের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ষষ্ঠবারের মত ভাষণ দিয়ে রেকর্ড গড়েন কে?
উত্তর : প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী।
২২. এজেন্সি বেনিন প্রেস (ABP)-কোন দেশের সংবাদ সংস্থার নাম?
উত্তর : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিন।
২৩. গিনি বিসাউ-এর প্রধান জনগোষ্ঠীর নাম কি?
উত্তর : বালান্তি।

আইকিউ

[কুইজ-১ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩১শে আগস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে–বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/১ :

১. মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন মাযহাব ও দলে বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ কি?
২. কত হিজরীতে কা'বা শরীফে চার মুছাল্লা কায়েম হয় এবং তা উৎখাত হয়?
৩. 'বাহরুল উলূম' কাকে বলা হয়?
৪. ২০১২ সালের কত তারিখে আরাকানের রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়?
৫. ইসলামী খেলাফত কেবলমাত্র কিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব?
৬. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা কয় ভাগে বিভক্ত?
৭. কত সালে কে ইংল্যান্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণা প্রথম প্রবর্তন করেন?
৮. তুরস্কে ইসলামী খেলাফত কে কত সালে উৎখাত করেন?
৯. মিশকাতুল মাছাবীহ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে কবে আগমন করে?
১০. সুনান আবুদাঊদ কত হিজরীতে দিল্লীতে মওজুদ ছিল?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক ১০. গ।

গত সংখ্যার বিজয়ীদের নাম : (ক) মুহাম্মাদ জাহীদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা) (খ) মেহেদী হাসান (নওদাপাড়া, রাজশাহী) (গ) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (মোহনপুর, রাজশাহী)।

বর্ণের খেলা ২/২ :

[বর্ণের খেলাটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩১শে আগস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে।

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে ব্যক্তির নাম দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে অন্য একটি ব্যক্তির নাম পাবেন।



১............................
২............................
৩............................
৪............................

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম...............................

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : (১) আলবানী (২) মাহমূদ (৩) মাবরুক (৪) মুহাম্মাদ; **অদৃশ্যে থাকা নাম :** আহমাদ।

গত সংখ্যার বিজয়ীদের নাম : (ক) মেহেদী হাসান (নওদাপাড়া, রাজশাহী) (খ) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (মোহনপুর, রাজশাহী) (গ) খলীলুর রহমান (পাংশা, রাজবাড়ী)।

শব্দজট ৩/২ :

[শব্দজটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩১ শে আগস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, ১০ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
	■		■	■	৬	
৭	৮	■	৯			■
■	১০			■	১১	১২
১৩		■	■	■	■	
■	১৪			■	১৫	

পাশাপাশি :

১. হিজরী সনের প্রবর্তক ৩. ইটের তৈরী গৃহ ৫. প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী ৪. খড়িমাটি ৭. নবীন ৯. পুষ্পোদ্যান, ফুলবাগান ১০. প্রাণনাশ, বধ ১১. চাকাযুক্ত মালবাহী মোটর গাড়ি ১৩. তিতিড়্গা ১৪. নতুন অন্ন ১৫. ভরসা।

উপর-নীচ :

১. 'যুননুরায়েন' উপাধি প্রাপ্ত ছাহাবী ২. একটি আরবী মাস ৩. অর্পন ৪. দোযখ ৬. অস্থির ৮. চলমান ৯. মর্যাদা ১২. যাত্রীবাহী ত্রিচক্রযান।

গত সংখ্যার শব্দজটের উত্তর :

পাশাপাশি : ১. মানেফতাহ ৫. বিভু ৭. জেট ৮. পান ১০. ভাল ১২. কার্লমার্কস। **উপর-নীচ :** ২. ফরয ৩. রবি ৪. ঘাট ৬. ভুটান ৭. জেনেভা ৮. পারা ৯. ফাতেমা ১১. লব

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/২:

[সংখ্যা প্রতিযোগটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩১শে আগস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে।

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনোটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

+	−	×	÷

							=৪
৫		৪		৯		৩	
							=৬
৮		৪		১২		৩	
							=৮
২		৬		৮		২	

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : ৩□২+৪−৩□৭; ৮÷২□৩−৯□৩; ৪□৫−৭+৩□৯।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা :** বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*